সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৩৯-৪০
বার : সোমবার

১০ জুলাই- ২০২৩ ঈসায়ী
২৬ আষাঢ়- ১৪৩০ বাংলা
২১ জিলহজ্জ- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল-কুরআনের জ্যোতি** ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **আশুরার সিয়াম**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৫
- **প্রবন্ধ :**
  - **নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১০
  - **জীবিতদের যেসব 'আমল দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়**
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী- ১২
  - **দাজ্জালের আবির্ভাব ও মহানবী (ﷺ)-এর বাণী**
    ডা. সুলতান আহমদ- ১৭
  - **মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষাপ্রদান নিশ্চিতকরণে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির অপরিহার্যতা**
    এম. এ মতিন- ২০
  - **ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান**
    অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান- ২৫
- **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - **মূসা (আলাইহিস সালাম) ও খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৯
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩৩
- **সমাজচিন্তা :**
  - **বিবাহ ও উকিল বাবা প্রসঙ্গ**
    আবু মুহান্নাদ- ৩৫
- **বিস্ময়-বৈচিত্র্য :**
  - **ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু**
    মো. হারুনুর রশিদ- ৩৭
- **মহিলাজগৎ :**
  - **হিজাব পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেপথ্য**
    মীযান মুহাম্মদ হাসান- ৪০
- **কবিতা** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

সৌদি রাজকীয় উষ্ণ সংবর্ধনায় মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি

হাজ্জ এমন একটি 'ইবাদত, যাতে বিশ্ব মুসলিমের মহাসমাবেশ ঘটে। তালবিয়া ও তাকবীর ধ্বনিতে মক্কার মাশআরসমূহ মুখরিত হয়ে ওঠে। এ হজ্জ উপলক্ষ্যে সৌদি বাদশাহ নিজ খরচে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারদের রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ করিয়ে থাকেন। তারই অংশ হিসেবে এবার "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক রাজকীয় বিশেষ মেহমান হিসেবে হজ্জ সফরে আমন্ত্রিত হন। মাননীয় সভাপতি গত ২০ জুন' ২৩ সৌদি এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্যাগ করেন এবং যথাসময়ে সৌদি আরব পৌঁছেন। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মাননীয় সভাপতি সৌদি রাজকীয় মর্যাদা ও নিরাপত্তায় পবিত্র 'উমরাহ্ ও হজ্জ সম্পন্ন করেন –ফালিল্লাহিল হাম্দ। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয-এর অগ্রজ প্রয়াত বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর উপাধি 'জালালাতুল মালিক' বা মহামান্য বাদশাহ-এর পরিবর্তে কা'বা ও মসজিদে নববীর সম্মানার্থে উক্ত পদবীর বদলে নিজেকে 'খাদিমুল হারামাইন' তথা হারামে মক্কী ও হারামে মাদানীর খাদেম বা সেবক বলে নিজের পরিচয় দেন। তখন থেকে সৌদি বাদশাহ 'খাদিমুল হারামাইন' এ সম্মানে ভূষিত হয়ে আসছেন। শুধু নামে নয়; বরং সত্যিকারার্থে সৌদি বাদশাগণ হারামাইনের উন্নয়ন ও যাইফুর রাহমান তথা হজ্জ-'উমরাহ্কারীগণের সেবায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেই চলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ও সালাফী মানহাযের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে মুসলিম বিশ্বের অনুকরণীয় আদর্শরূপে সৌদি আরব সরকারকে কবুল করুন –আমীন।

'উমরাহ্ আদায়ের পর মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক মক্কা ডিভিশনের আপিল বিভাগের বিচারপতি শাইখ ফাহাদ আল আম্মারীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এ সময় সৌদি আরব পশ্চিম প্রবাসী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতির সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি মাননীয় সভাপতিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং তাঁর সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতি দক্ষিণ মক্কার ইসলামী দা'ওয়াহ সেন্টারের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার বাসেম মিন্শাবীর বাসভবনে নৈশভোজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কা'বার ইমাম শাইখ ফায়সাল আল গাযযাবী। মাননীয় সভাপতি কা'বার মান্যবর ইমামকে আগামী দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলনে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মহাসম্মেলনে তাশরিফ আনার সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রাজকীয় মেহমান হিসেবে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির এ হজ্জ সফরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাজপ্রাসাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান। বাদশাহ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব হতে বিশিষ্ট ৯ জনকে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর মাননীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বাদশাহর পক্ষে স্বাগত জানান রাজকীয় সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান। মাননীয় সভাপতি এ অনুষ্ঠানে সৌদি যুবরাজকে ধন্যবাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এতে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে মাননীয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি মক্কা ও মদীনা দুই হারাম কমিটির চেয়ারম্যান এবং কা'বার প্রধান ইমাম ও খতিব শাইখ ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইস-এর সাথে মতবিনিময় করেন। এ সুবাদে তিনি শাইখ সুদাইসকেও আসন্ন দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলনে আসার আমন্ত্রণ জানান। এতে শাইখ অংশ গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করে "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর সকল ভ্রাতা-ভগ্নীকে তাঁর পক্ষ হতে সালাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাননীয় সভাপতিকে অনুরোধ করেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মাননীয় সভাপতি হজ্জ সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ. রহমান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এমপি'র সাথেও মতবিনিময় করেন।

পরিশেষে বলা যায়, মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির এ হজ্জ সফরে দেশ, জমঈয়ত ও সৌদি আরবের সাথে ত্রিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়। এ জন্য মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি প্রথমে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি সৌদি বাদশাহ্ সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে-সাউদ, প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান, ধর্মমন্ত্রী শাইখ ড. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয আলুশ্-শাইখ, ধর্মসচিব শাইখ ড. আওয়াদ আল আনাযী, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আদ দুহাইলান এবং রিলিজিয়াস এটাশে মোবারক আল আনাযী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর অকুণ্ঠ প্রচারক 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'কে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ❑

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

۞ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ﴾

☆ "আল্লাহর 'ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথ ভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।" *(সূরা আন্ নাহ্ল : ৩৬)*

۞ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ﴾

☆ "এবং মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোনোই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করবেন।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৪৪)*

۞ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

☆ "অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে, অতএব তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।" *(সূরা আন্ নিসা : ৬৫)*

۞ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

☆ "নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেরদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী (আয়াতসমূহ) পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেন এবং নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৪)*

۞ ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴾

☆ "আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহর উপর কোনো অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে এবং আল্লাহ অতীব সম্মানী, মহাজ্ঞানী।" *(সূরা আন্ নিসা : ১৬৫)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

আশুরার সিয়াম

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِيْنَةَ فَرَأَى اليَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟»، قَالُوْا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوْسٰى، قَالَ : «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

সরল অনুবাদ

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। মহানবী (ﷺ) মাদীনায় এসে ইয়াহূদীদের দেখলেন তারা আশুরার সিয়াম পালন করছে। তিনি বললেন, এটা কী? তারা বলল, এটা একটা ভালো দিন, এটা এমন এক দিন যেদিন আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) এই দিন সিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অধিক হক্বদার। এরপর তিনি নিজে সিয়াম পালন করে এবং সকলকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।[১]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : তার নাম ‘আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল ‘আব্বাস। পিতার নাম ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব।[২] উপাধি ছিল আল-হিবর (মহাজ্ঞানী), আল-বাহর (সাগর)।[৩] তর্জমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং ইমামুল মুফাস্‌সিরীন (মুফাস্‌সিরদের ইমাম বা নেতা)।[৪] মাতার নাম লুবাবাহ্ বিনতু হারেস।[৫] তিনি কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূল (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই।[৬]

জন্ম : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] জন্মের পর তাকে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি শিশু ‘আব্দুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনিক করে এবং দু‘আ করেন।[৮]

ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবাহ্ হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিধায় ‘আব্দুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হয়।

হিজরত : তিনি স্বীয় পিতা-মাতার সাথে **১১** বছর বয়সে মক্কা বিজয়ের বছর মদীনায় হিজরত করেন।[৯] পথিমধ্যে জুহফা নামক স্থানে মহানবী (ﷺ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। নবী (ﷺ) তখন মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তাঁর সাথে শরীক হন।[১০]

ব্যক্তিগত গুণাবলী : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকাহশাস্ত্রে তিনি অসিম পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ থেকে খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস তরুণ প্রবীণ। তিনি হলেন মুফাস্‌সির সম্রাট।

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৪।*

[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ- (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।*

[৩] *তাক্বরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী, (দেওবন্দ : আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া, ১ম প্রকাশ- ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ৩০৯।*

[৪] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু ‘আলামীন- নুবালা (জিদ্দাহ : দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ- ১৪১১/১৯৯১), ১/২৭৭।*

[৫] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, (তেহরান : আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, তা.বি.), ৩/১৯৩।*

[৬] *মিশকাত আল-মাসাবীহ- ওয়ালিউদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খাত্বীব, (দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানবী, তা. বি.), পৃ. ৬০৩।*

[৭] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ- ১৪১১/১৯৯০), ৩/৬২৭।*

[৮] *উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, ৩/১৯৩।*

[৯] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু ‘আলামীন- নুবালা, ১/২৭৭।*

[১০] *তুহফাতুল আশরাফ লি মারিফাতিল আতরাফ- হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, (ভুণ্ডিমাবাদি, ভারত : আদ-দারুল কাইয়েমাহ ১৪০৩/১৯৮২), ভূমিকা, পৃ. ৮।*

চারিত্রিক গুণাবলী : তিনি ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। উদারতা, সততা ও কোমলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১১] ৩৭ ও ৩৮ হিজরিতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যু : 'ইল্‌মে হাদীস ও তাফসীরের এই মহান সাধক 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান। ইবনু যুবায়েরের আমলে ৬৭/৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন।[১২] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৭৫ বছর বয়সে তায়েফে মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِيْنَةَ فَرَأَى اليَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

"মহানবী (ﷺ) মাদীনায় এসে ইয়াহুদীদের দেখলেন তারা আশুরার সিয়াম পালন করছে।"

মহানবী (ﷺ) হিজরত করে মাদীনায় যাওয়ার পরে ইয়াহূদীদেরকে আশুরার সিয়াম রাখতে দেখলেন। তাদের সিয়াম রাখার কারণ জেনে নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং সাহাবীদের তা পালনের নির্দেশ দিলেন।

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, মহানবী (ﷺ) মাক্কী জীবনে জাহিলিয়াতের সময় কুরাইশদের সাথে এই সিয়াম আদায় করেছেন।

তথাপি হিজরতের পর মাদীনায় এসে ইয়াহুদীদের কাছে জিজ্ঞেস করা ও পুনরায় 'আমল করা সম্পর্কে ক্বাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : মহানবী (ﷺ) মক্কায় আশুরার সিয়াম পালন করতেন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর মাদীনায় এসে আহলে কিতাবদের থেকে অবগত হয়ে পুনরায় এই সিয়াম পালন করেন।[১৪]

فَقَالَ : «مَا هَذَا؟»، قَالُوْا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ.

"তিনি বললেন, এটা কী? তারা বলল, এটা একটা ভালো দিন, এটা এমন এক দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।"

এখানে ভালো বা শ্রেষ্ঠ দিনের অর্থ হলো– এদিনে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের কবল থেকে মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং বানী ইসরাঈলকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন; অন্যদিকে ফিরআউন ও তার বংশীয়দেরকে সাগরে সমাধিস্থ করেছিলেন।

فَصَامَهُ مُوْسَى، قَالَ : «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

"সুতরাং মূসা (আলাইহিস সালাম) এই দিন সিয়াম পালন করেছেন। তিনি [নবী (ﷺ)] বললেন : আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অধিক হক্বদার। এরপর তিনি নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং সাহাবীদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।"

এই দিনের মর্যাদার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার লক্ষ্যে মূসা (আলাইহিস সালাম) সিয়াম পালন করেছিলেন। ফলে নবী (ﷺ) নিজে এই দিনটিতে সিয়াম পালন করেন এবং সাহাবীদেরকে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন এবং তিনি বলেন : "মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মুক্তি লাভের কারণে সিয়াম পালন করার অধিক হক্বদার আমরাই।"

আশুরা কী?

আশুরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহার্‌রম মাসের দশম তারিখই হলো আশুরার দিন। এটা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ।

[১১] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু 'আলামীন- নুবালা, ১/২৮০।*
[১২] *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু 'আলামীন- নুবালা, ১/২৮০।*
[১৩] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, ৩/৬২৭।*
[১৪] *সহীহ মুসলিম লি শারহিন নাব্বী- ৩৫৯ পৃ.।*

অতএব মুহার্‌রম মাসের দশম তারিখে সিয়াম রাখার নামই হলো আশুরার সিয়াম।[১৫]

আশুরার সিয়ামের প্রেক্ষাপট : মহান আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ এই দিনে সিয়াম রাখা হয়, কারণ আল্লাহপাক এই দিনে তাঁর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তার ক্বাওমকে ফির'আউন ও তার দলবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আলোচ্য হাদীসটির বর্ধিত অংশে বলা হয়েছে যে, আশুরা এমন একটি দিন, যে দিনে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কিশতী জুদী পর্বতে অবতরণ করে, ফলে তিনি শুকরিয়াস্বরূপ এ দিনটিতে সিয়াম রাখেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবী ও উম্মাতের মাঝেও আশুরায়ে মুহার্‌রমে সিয়াম রাখার 'ইবাদত চালু ছিল।

আশুরার সিয়ামের হুকুম : ইসলামের পূর্ব যুগ হতেই এ সিয়ামের প্রচলন রয়েছে, অতঃপর নবী (ﷺ)-এর মাধ্যমে তা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য 'ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। রামাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার পর এটা সকলের ঐক্যমতে সুন্নাত। কিন্তু রামাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার পূর্বে তার হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণ ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, কেউ ওয়াজিব বলেছেন আবার কেউ সুন্নাত বলেছেন, তবে অনেকেই ওয়াজিব বলেছেন, কারণ নবী (ﷺ) নিজে সিয়াম রেখেছেন এবং সাহাবীদের সিয়াম রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে গেলেন তখন তিনি নিজে সিয়াম রাখলেন এবং অন্যদের সিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর যখন রামাযানের সিয়াম ফর্‌য হলো তখন তিনি বললেন : যার ইচ্ছা হয় আশুরার সিয়াম রাখবে আর যার ইচ্ছা না রাখবে।[১৬]

আশুরার সিয়ামের ফযীলত : আশুরার সিয়াম বড় ফযীলতপূর্ণ। কেননা হাদীসে এসেছে–

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا) يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ".

মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, সে বছর হুমাইদ ইবনু 'আব্দুর রহমান তাকে আশুরার দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এ দিন সিয়াম রাখা ফর্‌য করেননি। তবে আমি সিয়াম রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা সে তা পালন করুক আর যার ইচ্ছা সে তা পালন না করুক।[১৭]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، (رضى الله عنهما) وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ، يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ. فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ رَمَضَانَ.

'উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ ইয়াযীদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে সিয়াম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রামাদ্বান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে সাওম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।[১৮]

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهَا) قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন সিয়াম পালন করত। জাহিলিয়াতের যুগে আল্লাহর রাসূল

[১৫] *মিরআতুল মাফাতিহ- ৭/৪৫ পৃ.।*
[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৩।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৩।*
[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫২।*

(ﷺ)-ও এ দিন সিয়াম রাখতেন। তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমতঃ) তিনি এ সিয়াম পালন করেছেন এবং তা রাখার হুকুমও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রামাযানের সিয়াম ফর্‌য হয় তখন তিনি আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেন। অতঃপর যার ইচ্ছা সে তা রাখত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[১৯]

আশুরার রোযার ফযীলত সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ (ﷺ) رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ "أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ".

সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া‘ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (ﷺ) আসলাম সম্প্রদায়ের এক লোককে আদেশ করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন সিয়াম পালন করে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ আজ হলো আশুরার দিন।[২০]

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا، قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ".

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীরা আশুরার দিনকে ‘ঈদ’ মনে করত। নবী (ﷺ) (সাহাবাগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিন সিয়াম পালন করো।[২১]

আশুরার সিয়ামের সংখ্যা

হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدَ اللهِ، بْنَ عَبَّاسٍ (رضى الله عنهما) يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ". قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ).

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আশুরার দিন সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! ইয়াহুদী এবং নাসারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যু হয়ে যায়।[২২]

অতএব দশম তারিখের আগে একদিন অথবা পরে একদিন যোগ করে দু’দিন সিয়াম রাখা হলো উত্তম। নবী (ﷺ) বলেন : তোমরা আশুরার সিয়াম রাখো ইয়াহুদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করো এবং দশম তারিখের আগে একদিন অথবা পরে একদিন মিলিয়ে সিয়াম রাখো।[২৩]

আশুরার রোযা রাখার পদ্ধতি : কোনো কোনো আহলে ‘ইল্‌ম বা বিদ্বানগণ আশুরার রোযা রাখার তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন :

১ম পদ্ধতি : ৯ ও ১০ অথবা ১০ এবং ১১ই মুহার্‌রাম রোযা রাখবে।

২য় পদ্ধতি : ১০ই মুহার্‌রাম তারিখে শুধু একটি রোযা রাখবে। এটি জায়িয, মাকরূহ নয়।

৩য় পদ্ধতি : ৯, ১০ ও ১১ই মুহার্‌রাম তারিখে রোযা রাখা। এই তৃতীয় পদ্ধতিটিই উত্তম ও পরিপূর্ণ।

আশুরার সিয়াম কোন ধরনের পাপের জন্য কাফ্‌ফারা?

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আশুরার সিয়াম সকল সগীরাহ গুনাহের কাফ্‌ফারা। অর্থাৎ- এ সিয়ামের কারণে আল্লাহ তা‘আলা কবীরাহ নয়; বরং (পূর্ববর্তী এক বছরের) যাবতীয় সগীরাহ গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এরপর তিনি বলেন, আরাফার সিয়াম দুই

[১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০২।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৭।*
[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৫; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৯৬৮৯।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৬।*
[২৩] *সহীহ ইবনু খুজাইমাহ্- হা. ২০৯৫।*

বছরের (গুনাহের জন্য) কাফ্ফারা, আশুরার সিয়াম এক বছরের জন্য কাফ্ফারা, যার আমীন ফেরেশ্তাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে হাদীসে বর্ণিত এসব গুনাহ মাফের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির 'আমলনামায় যদি সগীরাহ্ গুনাহ থেকে থাকে তাহলে এসব 'আমল তার গুনাহের কাফ্ফারা হবে অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তার সগীরাহ গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি সগীরাহ-কবীরাহ কোনো গুনাহই না থাকে তাহলে এসব 'আমলের কারণে তাকে সাওয়াব দান করা হবে, তার মর্যাদা উচ্চ করা হবে। আর 'আমলনামায় যদি শুধু কবীরাহ গুনাহ থাকে সগীরাহ নয় তাহলে আমরা আশা করতে পারি, এসব 'আমলের কারণে তার কবীরাহ গুনাহসমূহ হালকা করা হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, পবিত্রতা অর্জন, সালাত, রামাযান, আরাফা ও আশুরার সিয়াম ইত্যাদি কেবল সগীরাহ গুনাহসমূহের কাফ্ফারা অর্থাৎ- এসব 'আমলের কারণে কেবল সগীরাহ গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[২৪]

আশুরার সিয়াম কি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কেন্দ্র করে?

আশুরা উপলক্ষে যে সিয়াম পালনের বিধান সেটি ফির'আউনের কবল থেকে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নাজাতের শুকরিয়া হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। 'এর সাথে হুসাইন ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে। তবে ইসলামী শরিয়তে কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার সিয়ামের কোনো সম্পর্ক নেই। শাহাদাতে হুসাইনের নিয়তে সিয়াম পালন করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং ওয়াহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।' আমাদের দেশে আশুরায়ে মুহার্‌রমকে শোকের মাস হিসেবে পালনের রেওয়াজ রয়েছে। আর এর কারণ হলো হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কারবালা প্রান্তরে শাহাদতবরণের মর্মান্তিক ঘটনা। কারবালার সেই ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও ইসলামের ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনার একটি। এই ঘটনা তথা ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা, বর্ণনা করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারবালার ঘটনার স্মরণ করে কোনো কিছু বাড়াবাড়ি করা, শিয়াদের ন্যায় বুক চাপড়ানো, লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেয়া, শোকের মাতম করা, হক্ব ও বাতিলের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করা, হুসাইনের নামে পাউরুটি বানিয়ে বরকতের পিঠা বলে বিক্রয় করা, কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে।'[২৫]

এই দিনকে স্মরণ করার মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় :

ক) নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসরণে এই দিনে রোযা রাখা সুন্নাত।

খ) আশুরার পূর্বের অথবা পরের একদিনসহ ইয়াহুদীদের খেলাফ করে রোযা রাখা ভালো। কারণ নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াহুদীদের প্রতিটি কাজের বিরোধিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

গ) এই দিনটি এক মর্যাদাপূর্ণ দিন এবং প্রাচীনকাল থেকেই এর পবিত্রতা ও নিষিদ্ধতা স্বীকৃত। (এ মাসে তাদের অস্ত্র কোষাবদ্ধ করে রাখত)

ঘ) এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্বের উম্মাতগণ চাঁদ অনুযায়ী সময়-তারিখ নির্ধারণ করতেন; ইংরেজি মাসের অনুযায়ী নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবহিত করেছেন যে, ১০ মুহার্‌রাম এমন এক দিন, যে দিনে আল্লাহপাক ফির'আউন ও তার দলকে ধ্বংস করেছেন, আর মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তার অনুসারীদেরকে নাজাত দিয়েছেন।

ঙ) হাদীস থেকে এ দিন সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। এছাড়া এ দিনে অন্য যা কিছু সমাজে আজকাল পালন করা হয়, তা সবই বিদআত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের পরিপন্থি কাজ। ❑

[২৪] *আল-ফাতাওয়াল কোবরা- ৫ম খণ্ড।*

[২৫] *সহীহুল বুখারী ও মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭২৫।*

প্রবন্ধ

নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[অষ্টম পর্ব]

ধর্মীয় মূল্যবোধ মানবজাতিকে সভ্য, পরিশীলিত ও সংবেদনশীল করেছে। মানুষ, সমাজ-রাষ্ট্র ওই মূল্যবোধকে অবলম্বন করে সংহতি সাধন করেছে। গড়ে উঠেছে সাম্য ও সম্প্রীতির মজবুত বন্ধন। যার ফলশ্রুতিতে আজও দেখা যায় ধর্মসমূহে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরধর্মের প্রতি সম্মান সহমর্মিতাবোধ। বছর বিশেক আগে কোলকাতা কলুটোল মসজিদ দেখেছি। পাশেই সুবিশাল মন্দির। মন্দিরের শঙ্খধ্বনি যখন বাজে, উলুধ্বনিতে যখন এলাকা মুখরিত হয় তখন মুসলমানদের নামায কিংবা আযানের সময় নয়। মুসলমানদের নির্দিষ্ট সময়ের আযানের সময়ক্ষণ রপ্ত করে নিয়ে হিন্দুগণ তাদের ধর্ম-কর্ম করে। ধর্মীয় মূল্যবোধের কী অনুপম দৃষ্টান্ত!

বহমান সমাজে পোশাক পরিচ্ছদের শালীনতাবোধ কিন্তু মুসলমানদের সৃষ্টি বলতে পারেন। ঢিলা পোশাক মানুষের শারীরিক নিজস্বতা আচ্ছাদনে চমৎকার ইঙ্গিত বহন করে। যেটি আমাদের দেশে ধর্ম পরম্পরায় ব্যবহারের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে– শাড়ীর পরিবর্তে সালোয়ার কামিজ শুধু মুসলমানরাই পরে না; অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও দেখা যায়। অভিজাত ধর্মপরায়ণ হিন্দুদের মাঝে পাঞ্জাবীর সাথে শুধু ধূতিই চলে না; অধুনা পাজামা পরিধানের চল লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে যারা অভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে আসেন, তারা ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের অনুকরণ করে পোশাক পরতে শুরু করেন। আগ্রহ ও সম্প্রীতির অনুপম নিদর্শন হিসেবে হিন্দু রাজা-সামন্তরা অভিষেক উৎসবে মুসলিম পোষাকে ভূষিত হতেন। ভীতি কিংবা বাধ্যবাধকতা ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা ও নিকটজনের প্রতি ভালোবাসার প্রতিফল বলা যায়। বস্তুতঃ সে সময়ে উঁচু শ্রেণির একজন হিন্দু যদি তিলক কিংবা কানের কুণ্ডল ব্যবহার না করতেন, তাহলে তাকে অভিজাত শ্রেণির একজন মুসলমান থেকে পার্থক্য করা খুবই কষ্টকর ছিল। যাহোক– এমনিভাবে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে হিন্দু-মুসলমানের মাঝে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একবিংশ শতকের শুরুতে আবার ধর্মকেই অবলম্বন করে বিচ্ছেদ-বিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে। যা কখনো কাম্য নয়। উভয় বাংলার নন্দিত কবি, নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'যার নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে জেনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না'। রুচি-সংস্কৃতির ভিন্নতা যেন পরস্পরকে বিষিয়ে তুলেছে।

গো-মাংস ভক্ষণ নিয়ে সম্প্রতি ভারতে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়া স্পেন্ড সাইটের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে গরুবিষয়ক হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগুলো হত্যা করেছে কমপক্ষে ৪৫ জন মুসলমানকে গরুর গোশত খাওয়ার অপরাধে (!) তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। গোমাংস ভক্ষণ কিন্তু আজও ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে এবং হিন্দুদের মাঝেও। ইতিপূর্বে আমার একটি লেখায় উল্লেখ করেছি যে, মেঘালয় রাজ্যে হিন্দুদের মাঝে নির্দ্বিধায় গো-মাংস ভক্ষণ চলছে। বিজেপি প্রধান আরমেস্ট মাউরি বলেছেন, 'মেঘালয়ে গরুর মাংস ভক্ষণে কোনো বাধা নেই।' কারণ এটি এখন লাইফ স্টাইল। মাউরি জানিয়েছেন, তিনি নিজেও গোমাংস ভক্ষণ করেন। মাউরির গোমাংস ভক্ষণের প্রবণতা আমাদের কৌতুহলী করে তুলে। আমাদের অনুসন্ধান মতে প্রমাণিত যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে গোমাংস খাওয়ার চল ছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দুরা প্রচুর গোমাংস ভক্ষণ করতেন। ব্যাসঋষী স্বয়ং বলেছেন, "রতিদেবের যজ্ঞে একদিন পাচক ব্রাহ্মণগণ চিৎকার করে ভোজনকারীদের সতর্ক করে বললেন, মহাশয়গণ অদ্য অধিক মাংস ভক্ষণ করবেন না, কারণ অদ্য অতি অল্পই গোহত্যা করা হয়েছে (কেবলমাত্র একুশ হাজার)।"[২৬] বৌদ্ধযুগের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুরা যে প্রচুর পরিমাণ গরু গোশ্ত খেতেন ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত Beef in India গ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে। এতদ্ব্যতীত, স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত 'সোহংগীত,' সোহংসংহিতা, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রণীত 'জাতি গঠনে বাধা' গ্রন্থসমূহ হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য মেলে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে জানা যায়, বৌদ্ধ যুগের আগে হিন্দু সমাজে গোমাংস ভক্ষণ মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। মধু ও গোমাংস না খাওয়ালে তখন অতিথি আপ্যায়নই অপূর্ণ থেকে যেত। গোমাংস উপাচারে সম্মানিত অতিথি 'গোঘ্ন' নামে ও অভিহিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ- গোমাংস ছাড়া যে সমাজ ও আতিথেয়তা অচল।

হিন্দুদের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে গোমাংস ভক্ষণের বিষয় বিস্তর আলোচনা পাওয়া যায়। ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ নং সুক্তের ৪৩ নম্বর শ্লোকে বৃষ মাংস খাওয়ার কথা

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[২৬] *সাহিত্য সংহিতা*- খন্ডত, পৃ. ৪৭৬।

আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ২৯ নং সুক্তের ৮ নম্বর শ্লোকেও অনুরূপ তথ্য মেলে। মোষ বলি আজও হয়। নেপালে যারা মোষের মাংস খায়, তাদের 'ছেত্রী' বলা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, গোমাংস উপাচারে অতিথি সেবা ছিল তখনকার খাদ্যাভ্যাসের নমুনা। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রামচন্দ্রের সুপ্রিয় আমিষ ছিল গোবৎসের মাংস। বনবাসকালে রামচন্দ্রের মেন্যু ছিল তিন রকম; মদ (আসব), গৌড়ি (গুড় থেকে তৈরি), পৌষ্টি (পিঠে পচিয়ে তৈরি) মাধ্বী (মধু থেকে তৈরি)। এর সঙ্গে প্রিয় ছিল শূলপক্ক গো বৎসের মাংস। বেদে বৃষ ও মহিষের মাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।[২৭]

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আরও বলা হয়েছে পয়স্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয়।[২৮] গোহত্যার স্থানে গাভী হত্যা হত।[২৯] ইন্দ্রের সন্তোষ অর্জনের জন্য গো-বৎস উৎসর্গ করা হতো।[৩০] এমনকি উপনিষদে বলা আছে, স্বাস্থ্যবান সন্তান লাভ করতে হলে ষাড়ের মাংস খাওয়া জরুরি।

রাম প্রসাদের গুরু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎতন্ত্রসারে' অষ্টবিধ মহা মাংসের মধ্যে প্রথমেই গোমাংসের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোমাংসের যথেচ্ছ ভক্ষণ প্রসঙ্গে মাহাত্ম্য গান্ধীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন I Know There are scholars who tell us That cow Sacrifice is mentioned in the Vedas. I read a sentence in our Sanskrit text-book to the effect that Brahmnis of the old (period) used to eat beef. অর্থাৎ- আমি জানি (কিছু সংখ্যক পণ্ডিত আমাদের বলেছেন) বেদে গো-মাংস উৎসর্গের কথা উল্লেখ আছে। আমি আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ বাক্য পাঠ করেছি যে, পূর্বে ব্রাহ্মণরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন।[৩১] অতএব প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু ধর্মে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। তথ্যমতে তদীয় ধর্মসম্মত বটে।

বেদাদি গ্রন্থসমূহে গোমাংস ভক্ষণের বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় শ্লোকের উদ্ধতি দিয়ে গোমাংস ভক্ষণ থেকে নিষিদ্ধ করার প্রয়াস লক্ষণীয়। শ্লোকসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তারা প্রমাণ করতে চায়। যেমন অথর্ব বেদের ৮/৩/১৫ শ্লোকে গো হত্যা ও ঘোড়া হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু শ্লোকের বাংলা রূপান্তরে ভিন্ন বার্তা পাওয়া যায়। 'যারা বহিঃশত্রু দেশকে আক্রমণ করবে এবং প্রাণীর মাংস, ঘোড়ার মাংস ও মানুষের মাংস খায় তাদের হত্যা করো'। এখানে গো-মাংসাসীর কথা নেই; নেই প্রতিরোধ কিংবা বারনের প্রসঙ্গ।

অথর্ব বেদের একটি শ্লোকের (৮/৩/১৫) উদ্ধৃতি দিয়ে দুধ গ্রহণকারীকে শাস্তির আওতায় আনার কথা পাওয়া যায়। ৮/৩/১৭ নম্বর শ্লোকে গরুর দুধ পানকারীর বুকে বর্শা মারার কথা উল্লেখ আছে। তাহলে কী হিন্দুধর্মে দুধ নিষিদ্ধ? দুগ্ধজাত দ্রব্য মিঠাই-মণ্ডা, দধি! মজার ব্যাপার হলো ঋগ্বেদের ১/১৬৪/৮০ এবং অথর্ব বেদের ৯/১০/২০ ও ৭/৭৩/১১ আয়্যা হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আয়্যা অর্থ যে গরু দুধ দেয়। তাকে হত্যা যাবে না। চমৎকার! মা গরু হত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্য গরু; বলদ, বাছুর? নিষিদ্ধের প্রসঙ্গে কিন্তু এসব উল্লেখ নেই। যদি থাকতো তবে রামচন্দ্রের শূলপক্ক গোমাংস ভক্ষণের প্রসঙ্গ আসতো না।

সুপ্রিয় পাঠক! যুক্তির বেড়াজালে আড়ষ্ট ব্যক্তিবর্গই প্রকারান্তরে গোমাংস ভক্ষণের ইঙ্গিতবাহী উপমা উপহার দিয়ে চলেছেন। ব্যক্তি কিংবা ধর্ম বিশেষ ঘায়েল করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বহুল প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস গোমাংসে ব্যবহার যে সত্য সে বিষয়টি তথ্যের আলোকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। একটি সম্প্রদায়কে গোমাংস ভক্ষণ তো দূরের কথা বহনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেশ ছাড়া করার প্রবণতায় আমরা ব্যথিত। বিস্মিত।

সম্প্রতি পবিত্রতার রেশ ধরে 'কাউ হাগডে' (গরু আলিঙ্গন দিবস) পালন করছে। দেশটির পশু কল্যাণ বিষয়ক বিভাগ দেশবাসীকে রাষ্ট্রীয় এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে'র বিকল্প হিসেবে তারা আলিঙ্গন দিবস পালন করতে চায় আল জাজিরার খবরে এমনটি বলা হয়। এনিম্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড অব ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, গরুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে না-কি মানসিক সমৃদ্ধি অর্জন হবে! বৃদ্ধি পাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সুখ! কী আশ্চর্য প্রবণতা! পবিত্রতা থেকে আলিঙ্গন ধারণাটির পটভূমি কিন্তু চমকপ্রদ। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝাঁ[৩২] লিখেন, 'ভারতে বৈদিক যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-১৫০০) পবিত্র গরু ধারণাটি ছিল না'।

বৈদিক আর্যরা গরু বলিদান করত এবং এর মাংস খেত। বলিদানের জন্য নির্বাচিত গরু পবিত্র। সম্ভবত তখন থেকে পবিত্র কথাটি যোগ হয়। কিন্তু পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও বহু শতক ধরে মাংস খাওয়া থেকে সমাজ বিরত থাকেনি? পবিত্রতার সংবেদনশীল বিবেচনাতেও গরুর চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি ও ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি! ❑

[২৭] *বেদ* : ১/১৬৪/৪৩; ৫/১৯/৮।
[২৮] *বেদ* : ৪/১/৬।
[২৯] *বেদ* : ১০/৮৯/১৪।
[৩০] *ঋগবেদ*- ১০/৮৬/১৪।
[৩১] M K Gandhi, *Hindu Dharma*, New Delhi-1991, P. 120।
[৩২] Dijendra Narayana Jha, *The MyThs Ths Holy Cow*, Verso, 2002।

জীবিতদের যেসব ‘আমল দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী*

আল্লাহ মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর ‘ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই তার ‘আমল করার সময়। মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তার ‘আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাই পরকালে শান্তিময় জীবন লাভ করতে চাইলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুর পূর্বে ভালো ‘আমল করে যেতে হবে। আমাদের সমাজের লোকেরা তাদের পরলোকগত পিতা-মাতাসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক ধরনের ‘আমল করে থাকে। তারা চায় তাদের স্বজনগণ পরকালে শান্তিতে থাকুক। তারা বার বার প্রশ্ন করে, আমরা আমাদের মৃত মা-বাবার জন্য কী করতে পারি? যার মাধ্যমে তারা কবরে শান্তিতে ঘুমাতে পারেন।

আসুন! আমরা জেনে নেই মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরও কোন ধরনের ‘আমল দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। আমরাই বা তাদের জন্য কী করতে পারি। সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু’প্রকার ‘আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে। **(১)** জীবিত থাকাবস্থায় কৃত ‘আমল। যেমন- মহান আল্লাহর রাস্তায় কোনো সম্পদ ওয়াক্ফ করে যাওয়া, সৎকাজে সম্পত্তি খরচ করার ওয়াসীয়ত করে যাওয়া, সাদাক্বায়ে জারিয়া করে যাওয়া ইত্যাদি। **(২)** এমন ‘আমল, যা মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তিগণ করে থাকে। যেমন- মৃত ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের দু‘আ ও মহান আল্লাহর দরবারে তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা, মৃত ব্যক্তির জন্য দান-সাদাক্বাহ্ করা, তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা, রোযা রাখা ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার ‘আমলের বর্ণনা : মৃত্যুর পূর্বে জীবিত অবস্থায় কৃত ‘আমল দ্বারা উপকৃত হওয়ার দলিল–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، قَالَ : "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “মানুষ যখন মারা যায়, তখন সমস্ত ‘আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ‘আমলের দরজা বন্ধ হয় না। (১) সাদাক্বায়ে জারিয়া। (২) যদি এমন সন্তান রেখে যায়, যে পিতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করবে। (৩) যদি এমন দ্বীনী শিক্ষা রেখে যায়, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।[৩৩]

অত্র হাদীসের মাধ্যমে একথা জানা গেল যে, কোনো মানুষ যদি জীবিত থাকা অবস্থায় সাদাক্বায়ে জারিয়া করে যায়, তাহলে উক্ত সাদাক্বাহ্ দ্বারা যতদিন মানুষ উপকৃত হবে, ততদিন পর্যন্ত সাদাক্বাহ্কারীর ‘আমলনামায় সাওয়াবের একটা অংশ পৌঁছতে থাকবে। এমনিভাবে যদি কোনো মুসলমান দ্বীনী কোনো শিক্ষা রেখে যায় যেমন ইসলামী বই-পুস্তক রচনা করা, ছাত্রদেরকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা, ইসলামী লাইব্রেরি বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা, নির্মাণে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যদি কেউ সৎ সন্তান রেখে যায় এবং সে সন্তান মহান আল্লাহর কাছে পিতা-মাতার নাজাতের জন্য দু‘আ করে, তাহলে সে দু‘আর মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার : এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি ‘আমলের উল্লেখ করব যা দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে, অথচ সে এসব ‘আমল করে যায়নি বা এসব ‘আমলের কারণও ছিল না।

(১) মৃত ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের দু‘আ এবং মহান আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা : এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক দলিল রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا﴾

“তারা (মু’মিনগণ) বলেন– “হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না।”[৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা মৃত বা জীবিত পিতা-মাতা ও মু’মিনদের জন্য দু‘আ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বলেন :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

---

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।*

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩১।*

[৩৪] *সূরা আল হাশ্র : ১০।*

"হে আমাদের প্রভু! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দিন।"[৩৫]

এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

"এবং তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন- তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৩৬]

হাদীসে যে সমস্ত দলিল রয়েছে তা থেকে আবূ দাউদে 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন–

اَسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য ঈমানের উপর অবিচলতা ও দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।"

এছাড়া কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যে সমস্ত দু'আ হাদীসে এসেছে– তাতে একথারই প্রমাণ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে সে দু'আর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। মূলতঃ জানাযার নামায প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আস্বরূপ।

(২) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান-সাদাক্বাহ্ করা : এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মু'মিন জননী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) : إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই কোনো ওয়াসীয়ত করতে পারেননি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদাক্বাহ্ করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ করলে তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? রাসূল (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন।"[৩৭]

উপরোক্ত সহীহ হাদীসটির মাধ্যমে আমরা একথাই জানতে পারলাম যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করলে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছবে এবং তা দ্বারা সে উপকৃত হবে।

(৩) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা : তবে এক্ষেত্রে মানতের রোযা এবং রামাযানের কাযা রোযা উদ্দেশ্য। তার পক্ষ থেকে নফল রোযা রাখার কোনো দলিল নেই। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা বৈধ হওয়ার দলিল হলো 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীস।

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে।"[৩৮]

(৪) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ বা 'উমরাহ্ করা : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা আদায় হবে এবং মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করার দলিল হলো–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما)، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ)، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوْا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ.

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূল (ﷺ) বললেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তোমার কি ধারণা যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, অবশ্যই পরিশোধ করতাম। রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে আদায় করো। কেননা মহান আল্লাহর দাবি পরিশোধ করার অধিক উপযোগী।"[৩৯]

---

[৩৫] *সূরা ইবরা-হীম : ৪১।*
[৩৬] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৪।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১০০৪।*
[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫২ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৭।*
[৩৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫২।*

অন্য এক হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه)، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ : أَخٌ لِيْ أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে এভাবে তালবীয়া পাঠ করতে শুনলেন যে, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ অর্থাৎ- শুবরুমার পক্ষ থেকে আমার এ হজ্জ। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, শুবরুমা কে? উত্তরে লোকটি বলল, শুবরুমা আমার ভাই, অথবা বলল, সে আমার আত্মীয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি তোমার নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল না, করিনি। তিনি বললেন, আগে তোমার নিজের হজ্জ করো। তারপর শুবরুমার হজ্জ করো।[৪০]

উপরের হাদীস ২টির মাধ্যমে আমরা এটাই জানতে পারলাম যে, হজ্জ এমন একটি ‘ইবাদত যা একজন অন্যজনের পক্ষ হতে আদায় করতে পারে। তাই মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করলে, তা শুদ্ধ হবে এবং মৃত ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হবে। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো আলেম শর্তারোপ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি এবং যে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, তার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে এবং মৃত ব্যক্তি যদি হজ্জ না করেই মৃত্যুবরণ করে থাকে। অন্যান্য আলেমগণ আত্মীয়তার শর্তারোপ করেননি। এমনিভাবে যদি কোনো জীবিত লোক শারীরিকভাবে হজ্জ করতে অক্ষম হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়, তখনও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করা যেতে পারে। ‘উমরার বিধানও হজ্জের অনুরূপ। তবে মৃত ব্যক্তির নামে যে লোক হজ্জ বা ‘উমরাহ্ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো– সে আগে নিজের হজ্জ-‘উমরাহ্ করে নেবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুবরুমাকে বলেছেন– আগে তোমার নিজের হজ্জ করো।

(৫) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করলে তার সাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়ার পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন একটি দুম্বা উপস্থিত করতে বললেন, যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো এবং পেট কালো। অতঃপর তা কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)-কে বললেন, ছুরি এনে পাথর দ্বারা ধারালো করো। তিনি তাই করলেন। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছুরি হাতে নিয়ে দুম্বাটিকে শুইয়ে দিলেন। পশুটি যবেহ্ করার সময় বললেন, বিস্‌মিল্লা-হ, হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর বংশধর এবং সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কবুল করো।[৪১]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ، فَقَالَ : هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ.

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দুম্বা কুরবানী দিলেন এবং জবাই করার সময় বললেন, এটা আমার উম্মাতের ঐসব লোকদের পক্ষ থেকে, যারা কুরবানী করতে পারেনি।[৪২]

উপরের হাদীস দু’টির মাধ্যমে জানা গেল যে, কেউ যদি তার মৃত মাতা-পিতা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের পক্ষ থেকে কুরবানী করে তবে তা বৈধ হবে।

উপরোক্ত ‘আমলগুলো ছাড়া মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিক্‌র-আযকার পড়া মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা, প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ও মিলাদ শরীফ পাঠ করা বিদআত। এগুলোর পক্ষে কোনো দলিল নেই। আজকাল আমাদের সমাজে হাফেয ও ক্বারীদেরকে ভাড়া করে এনে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করানো হয়। এটাকে আমাদের দেশের পরিভাষায় সাবিনা পাঠ বলা হয়। অনেক সময় দু’পক্ষের মাঝে দরকষাকষি করে হাদিয়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সর্বযুগের সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ভাড়া করা হাফেয-ক্বারী দিয়ে কুরআন খতম করানো হারাম। পূর্বযুগের কোনো আলেম বা নির্ভরযোগ্য কোনো ইমাম এ ব্যাপারে অনুমতি দেননি। পরবর্তী যুগের কিছু পেট পূজারি দুনিয়াদার আলেম অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ

[৪০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১১।*

[৪১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৭।*

[৪২] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫০৫।*

আত্মসাৎ করার জন্য এ পন্থাটি চালু করেছে। এটি একটি বিদআতী 'আমল, যা মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণে আসবে না। এর দ্বারা যে টাকা উপার্জন করা হয়, তাও সম্পূর্ণ হারাম। আরো কঠোরভাবে হারাম হবে, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার ছোট ছোট ইয়াতীম শিশুদের সম্পদ থেকে এভাবে অন্যায়ভাবে ব্যয় ও ভক্ষণ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শরিয়তসম্মত পন্থায় মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য 'আমল করার তাওফীক্ব দিন এবং এক্ষেত্রে সবধরনের বিদআত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন –আমীন।

জীবিতদের যেসব 'আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়, তা সরাসরি দলিল দ্বারাই প্রমাণিত। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের কোনো দ্বিমত নেই। তবে যেসব 'আমলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে বলে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি, যেমন- নামায, কুরআন পাঠ, যিক্র-আযকার ইত্যাদি তা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে অন্য কেউ করতে পারবে কি-না অর্থাৎ- জীবিত ব্যক্তির সেসব 'আমলের সাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে কি-না, সে ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে দু'টি মত পাওয়া যায়।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন : নামায, রোযা, কুরআন পাঠ, যিক্র-আযকার ইত্যাদি সবকিছুর সাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। তাদের সর্বাধিক বড় দলিল হলো ক্বিয়াস। অর্থাৎ- যেসব 'আমলের কথা বর্ণিত হয়নি সেগুলোকে তারা রাসূল (ﷺ) থেকে অনুমোদিত 'আমলগুলোর উপর ক্বিয়াস করে থাকে। তারা আরো বলে থাকে 'আমলের সাওয়াব হলো 'আমলকারীর অধিকারভুক্ত। সে যাকে ইচ্ছা দিতে পারে। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুমুল্লাহ) এবং আরো অনেকের মতেই হাদীসে বর্ণিত 'আমলসমূহ এবং যেসব 'আমলের কথা বর্ণিত হয়নি, সেগুলোর সাওয়াবও মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠানো যাবে এবং তা দ্বারা তারা উপকৃত হবে। শাইখ ইবনু আবীল ইয (রাহিমাহুল্লাহ) বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এই মতকেই প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

অপর পক্ষে ইমাম মালেক, শাফে'য়ী এবং আরো অনেক আলেমের মতে মৃত ব্যক্তিরা শুধু জীবিতদের ঐসব 'আমল দ্বারা উপকৃত হয়, যেসব 'আমলের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং যেসব 'আমলের পেছনের জীবিত থাকাকালে মৃত ব্যক্তির ভূমিকা ছিল। সেগুলো হলো মৃত ব্যক্তির সাদাক্বায়ে জারীয়া, তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তানের দু'আ ও উপকারী 'ইল্ম এবং তার জন্য জীবিতদের দু'আ, সাদাক্বাহ্, হজ্জ, রোযা ও কুরবানী। এছাড়া জীবিতদের অন্যান্য 'ইবাদত যেমন নামায, কুরআন পাঠ ও যিক্র-আযকারের সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের জন্য পাঠানো নাজায়িয। পরবর্তীদের মধ্য হতে শাইখ আলবানী, 'আব্দুল 'আযীয বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীনসহ আরো অনেকে এই মতকেই সমর্থন করেছেন। শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الأصل في العبادة المنع

অর্থাৎ- দলিলবিহীন 'ইবাদত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে যেসব 'ইবাদত করার দলিল নেই, তা করা যাবে না। সেই সাথে তিনি আরো বলেন :

العبادة لايجري فيها القياس

অর্থাৎ- 'ইবাদতের মধ্যে ক্বিয়াস চলে না। যারা বলে 'আমলের সাওয়াবের মধ্যে 'আমলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে যাকে ইচ্ছা এই সাওয়াব দিতে পারে, তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, 'আমলের সাওয়াবের উপর 'আমলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'আমলের সাওয়াব দেয়ার বিষয়টি শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তা কবুল হলো কি না তা জানারও কোনো উপায় নেই। সুতরাং তাতে 'আমলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোনো মানুষই জানে না যে, তার 'আমল কবুল হলো কি না। সে তার 'আমলের সাওয়াব পাবে কি না, তাও জানে না। সুতরাং 'আমলকারী তার 'আমলের সাওয়াবের মালিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ﴾

"এবং যারা দান করে তাদের অবস্থা হলো, যা কিছুই তারা দান করে এমন অবস্থায় দান করে, তাদের অন্তর এ চিন্তায় কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।"[৪৩]

আয়াতের পুরোপুরি মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, মহান আল্লাহর রাস্তায় তারা যা কিছু খরচ করে সে জন্য একটুও অহংকার ও তাক্বওয়ার বড়াই করে না এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবার অহমিকায় লিপ্ত হয় না; বরং নিজেদের সামর্থ্য

[৪৩] *সূরা আল মু'মিন : ৬০।*

অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, না জানি এসব তাঁর কাছে গৃহীত হবে কিনা এবং রবের কাছে মাগফিরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কিনা।

ইমাম আহমাদ, আত্ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, হাকিম উপরোক্ত অর্থেই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! এই আয়াতের মমার্থ কি এই যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ও শরাব পান করার সময়ও আল্লাকে ভয় করবে? এর জবাবে নবী (ﷺ) বলেন : না, হে সিদ্দিকের কন্যা! এর অর্থ হচ্ছে– এমন লোক, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে, তার 'আমলগুলো কবূল হলো কি না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'আমল করলেই যে সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং সেই সাওয়াব যাকে ইচ্ছা দেয়া যাবে, এমন ধারণা ঠিক নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত : উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিক্র-আযকার মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা, প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ও মিলাদ শরীফ পাঠ করা সম্পূর্ণরূপে বিদআত। এগুলোর পক্ষে কোনো দলিল নেই।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়ায় এসেছে যে, আমরা জানি না যে, নবী (ﷺ) কখনো কুরআন পড়ে তার সাওয়াব আত্মীয়দের বা অন্য কাউকে দান করেছেন। কুরআন পড়ার সাওয়াব যদি মৃতদের কাছে পৌঁছত, তাহলে আবশ্যই তিনি পাঠানোর জন্য আগ্রহী হতেন এবং উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন। যাতে করে তারা তাদের মৃতদের উপকার করার সুযোগ পেতে পারে। নবী (ﷺ) উম্মতের জন্য খুবই দয়ালু ছিলেন। নবী (ﷺ)-এর পরে তাঁর ন্যায়পরায়ণ খলীফাগণ এবং তাদের পরে সাহাবীগণ তাঁর আদর্শের উপর ছিলেন। আমরা জানি না যে, তাদের কেউ কুরআন পাঠ করে অন্যকে সাওয়াব দিয়েছেন। রাসূল (ﷺ), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবীদের পথে চলার মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ। বিদআত এবং নতুন নতুন বিষয়ের অনুসরণ করার মধ্যে যতসব অকল্যাণ। নবী (ﷺ) বিদআত থেকে সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন :

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة.

"তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"[৪৪]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৪৫] সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা জায়িয নেই। কুরআন পাঠের সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না; বরং এটি বিদআত। কুরআন পাঠ ছাড়া অন্যান্য 'ইবাদতের ব্যাপারে কথা হলো, যেগুলোর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছার কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা মেনে নেয়া আবশ্যক। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাক্বাহ্ করা, তার জন্য দু'আ করা এবং তার পক্ষ হতে হজ্জ করা। যে ব্যাপারে কোনো দলিল নেই, তা মৃত ব্যক্তির জন্য করা যাবে না, যতক্ষণ না দলিল পাওয়া যায়। তাই আলেমদের দু'টি মতের মধ্য হতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা জায়িয নেই, কুরআন পাঠের সাওয়াবও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না। সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা বিদআত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিকভাবে 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

আলহাজ্জ এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি'র জন্য দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রধান উপদেষ্টা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ঢাকা-১১ আসনের সাংসদ আলহাজ্জ এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি বর্তমানে থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন এবং দেশ, জনগণ ও ইসলামের কল্যাণে তাঁর খিদমতসমূহ কবুল করুন।

[৪৪] *সুনান আবূ দাউদ- মা. শা., হা. ৪৬০৭, সহীহ।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*

দাজ্জালের আবির্ভাব ও মহানবী (ﷺ)-এর বাণী

–ডা. সুলতান আহমদ*

দাজ্জাল প্রসঙ্গে মানুষের মুখে মুখে অনেক কথা। এ ব্যাপারে আবার অনেকেই বানোয়াট কিসসা কাহিনি বলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চায়। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর উপর ভিত্তি করে যদি 'আমল করে এবং জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করে তা হলেই সফলতা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চিত্তে 'ইল্‌ম অর্জনের সামান্যতম প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে কিসসা কাহিনি আর থাকে না। প্রকৃত ঘটনা প্রবাহে আমজনতা কিছুটা হলেও সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। ইসলামে রং তামাশা নেই। ইসলামে রয়েছে চিরন্তন সত্য ঘটনা প্রবাহ এবং বাস্তব উদাহরণ। যাতে মানবকুল মহান আল্লাহর বিধানকে খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু বুঝার পরেও এক শ্রেণির মানুষ মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সর্বোত্তম আদর্শকে পরিহার করে কথিত ইমামের অন্ধ অনুসারী হয়ে সমাজকে অন্ধকারে ফেলে পরকালের অনাবিল শান্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপর দিকে ইসলামের তেরটা বাজাচ্ছে।

দাজ্জালের আবির্ভাব ও মহানবী (ﷺ)-এর বাণী হাদীসের আলোকে জানার, বুঝার ও মানার চেষ্টা করি। তাতেই রয়েছে সবার জন্যই অফুরন্ত কল্যাণ।

'আলী ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ)... আবূ উমামাহ্ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ ভাষণে যা তিনি আমাদের সামনে দিলেন, তা ছিল দাজ্জালের প্রসংগে। তিনি আমাদেরকে তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। এ পর্যায়ে তিনি বললেন : যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চাইতে আর কোনো বড় ফিত্‌না যামীনে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তার উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকাকালীন সময়ে যদি সে বের হয়, তাহলে আমি প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে আমার পরে বের হয়, তাহলে প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলিল পেশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের উপর নেগাহবান। নিশ্চয় সিরিয়া ও ইরাকের "খুল্লাহ" নামক স্থান থেকে বের হবে। আর সে তার ডান ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, আমি তোমাদের নিকট তার এমন সব অবস্থা বর্ণনা করবো, যা আমার পূর্বে কোনো নবী তার উম্মাতের কাছে বলেননি। প্রথমে সে বলবে যে, আমি নবী এবাং আমার পরে কোনো নবী নেই। এরপর সে দাবি করে বলবে, আমি তোমাদের রব! অথবা তোমরা তোমাদের প্রভুকে মরার পূর্বে দেখবে না। সে হবে কানা। আর তোমাদের রব তো অন্ধ নন! আর তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে "কাফির"। এই লেখাটি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে, সে লেখা পড়া জানুক বা নিরক্ষর হোক। তার ফিত্‌না হবে এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। সুতরাং যে কেউ তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চায় এবং সূরা আল কাহ্‌ফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তখন সেই জাহান্নাম তার জন্য ঠান্ডা-শান্তিময় স্থানে পরিণত হবে। যেমন হয়েছিল আগুন ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উপর।

দাজ্জালের অন্যতম এক ফিতনা হবে এই যে, সে এক বেদুইনকে বলবে– যদি আমি তোমার জন্য তোমার পিতামাতাকে জীবিত করতে পারি, তবে কি তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব! তখন সে বলবে– হ্যাঁ, তখন তার জন্য (দাজ্জালের নির্দেশে) দু'টি শয়তান তার পিতা ও মাতার আকৃতি ধারণ করবে। তারা বলবে– হে বৎস! তার আনুগত্য করো। নিশ্চয় সে তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে তাকে হত্যা করবে, এমনকি তাকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে নিক্ষেপ করবে। এরপর সে বলবে– তোমরা আমার এই বান্দার দিকে

* *উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সদস্য সচিব, আহবায়ক কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।*

লক্ষ্য করো, আমি একে এখনই জীবিত করছি। এরপরও কি কেউ বলবে যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তার রব আছেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে– তোমার রব কে? সে বলবে– আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দুশমন। তুই তো দাজ্জাল! আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে পারছি যে, (তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান তানফিসী (রাহিমাহুল্লাহ)... আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সেই ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে আমার উম্মাতের মধ্যে বুলন্দ হবে।

রাবী বলেন, আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করছি যে, এই ব্যক্তি 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ই হবে। এমনকি তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

মুহারিবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এরপর আমরা আবূ রা'ফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত হাদীস আলোচনা করবো। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টিপাতের জন্য নির্দেশ দিবে, তখনই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন সেও ফসলাদি উদগত করবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে একটি গোত্রের কাছে যাবে। তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, আরেকটি গোত্রের কাছে যাবে। তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিবে, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন যমীন তা উদগত করবে। যমীন এমনভাবে ফসলাদি ঘাস তৃণ লতাপাতা উদ্‌গত করবে যে, তাদের গৃহপালিত পশুগুলো সেদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত মোটা-তাজা এবং উদরপূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। অবস্থা এই হবে যে, দুনিয়ার কোনো ভূখণ্ড বাকি থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল গমন না করবে এবং তা তার পদানত হচ্ছে। তবে মক্কা মোয়ায্‌যমা ও মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত (অর্থাৎ- এই দুই শহরে সে প্রবেশ করতে পারবে না)। এই দুই শহরের প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ফেরেশ্‌তা মোতায়েন থাকবেন। এমন কি সে একটি ছোট লাল পাহাড়ের নিকট অবতরণ করবে, যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক্ব পুরুষ ও মহিলারা মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। এরূপে মদীনা তার ভেতরকার ময়লা বিদূরিত করবে, যেমনভাবে লোহার মরিচা হাপর দূর করে। সে দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস'।

অতঃপর উম্মু শারীক বিনতু আবুল আকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আরবের লোকেরা সেদিন কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : সেদিন তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবেন। তাদের ইমাম হবেন একজন নেক্‌কার ব্যক্তি। এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবেন। সে সময় 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সকাল বেলা (আকাশ থেকে) অবতরণ করবেন। তখন উক্ত ইমাম (তাঁকে দেখে) পেছন দিকে হটবেন, যাতে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের সালাতে ইমামতি করতে পারেন। তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাত উক্ত ইমামের দু'কাধের উপর রাখবেন এবং তাঁকে বলবেন : আপনি সামনে যান এবং সালাতে ইমামতি করুন। কেননা, এই সালাত আপনার জন্যই কায়েম হয়েছিল। (অর্থাৎ- আপনার ইমামতির নিয়্যাত করা হয়েছিল)।

তখন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন। যখন তিনি সালাত শেষ করবেন, তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলবেন : দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে। আর দরজার পেছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইয়াহুদী। এদের প্রত্যেকের কাছ তলোয়ার থাকবে, যা হবে কারুকার্যখচিত এবং থাকবে চাদরে আবৃত। যখন দাজ্জাল তাঁকে ['ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে] দেখবে, তখনই সে বিগলিত হয়ে যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। সে পালাতে থাকবে। তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলবেন : তোর প্রতি আমার একটি আঘাত আছে। এর থেকে বাঁচবার তোর কোনো উপায় নেই। পরিশেষে তিনি তাঁকে 'বাবে লুদের' পূর্ব দিকে পাবেন এবং তাকে কতল করে ফেলবেন। আর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের পরাভূত করবেন। তখন ইয়াহুদীরা মহান আল্লাহর সৃষ্ট যে কোনো জিনিসের

আড়ালে আত্মগোপন করে থাকুক না কেন, সে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করবেন, চাই তা পাথর হোক, গাছপালা হোক, প্রানী হোক অথবা জানোয়ার। তবে একটি গাছ হবে ভিন্নতর, যার নাম হবে (গারকাদাহ) এটা এক ধরনের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। একে ইয়াহুদীদের গাছ বলা হয় (সে কথা বলবে না); তবে সে বলবে– হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা। এই তো ইয়াহুদী। তুমি এসো এবং একে হত্যা করো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দাজ্জালের সময় হবে চল্লিশ বছর। তবে তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান। আরেক বছর হবে-এক মাসের সমান এবং এক মাস এক সপ্তাহের বরাবর হবে। তার শেষ দিনগুলা এমন ভয়াবহ হবে, যেমন অগ্নিস্ফুলিংগ বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কেউ মদীনার এক ফটকে সকাল যাপন করলে, অন্য ফটকে যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! এত ছোট দিনে আমরা সালাত কিভাবে আদায় করবো? তিনি বললেন : তোমরা অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করে থাক এবং এভাবে সালাত আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন, (শূকর ভক্ষণ করা হারাম করবেন এবং এমনভাবে হত্যা করবেন যে, তা একটাও অবশিষ্ট থাকবে না)। তিনি জিযিয়া মাওকুফ করবেন, সাদাক্বাহ্ উসূল করা বন্ধ করবেন, না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারের বিষ দূরীভূত হয়ে যাবে। এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু সে তার কোনো ক্ষতি করবে না। একজন ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে। সেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নেকড়ে বাঘ বকরীর পালে এমনভাবে থাকবে, যেন তা তার কুকুর অর্থাৎ- রক্ষক। পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পানিতে বরতন পরিপূর্ণ হয়। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারোর 'ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজ সরঞ্জাম রেখে দেবে। কুরায়শদের রাজত্বের অবসান হবে। যমীন রৌপ্য নির্মিত তশতরীর মতো হয়ে যাবে। সে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন করবে, যেমনিভাবে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যামানায় উদ্‌গত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের খোসার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই, এই মূল্যের এবং ঘোড়া স্পল্প মূল্যে বিক্রি হবে। তারা বললো : হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বললেন : কারণ লড়াই এর জন্য কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বললেন : সারা ভূ-খণ্ডে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যাতে মানুষে চরমভাবে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে এবং যমীনকে হুকুম করবেন, তখন তাও দুই তৃতীয়াংশ ফসলাদি কম উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন সে সম্পূর্ণভাবে শস্য উৎপাদন বন্ধ করবে। ফলে যমীনে কোনো ঘাস জন্মাবে না, আর কোনো সব্‌জি অবশিষ্ট থাকবে না; বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ তা'আলা যা চাইবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো– এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন : যারা তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু), তাক্‌বীর (আল্লাহ আকবর) তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) তাহ্‌মীদ (আলহামদুল্লিলাহ) বলতে থাকে, এসব তাদের খাদ্য নালিতে প্রবাহিত করে দেওয়া হবে।

আবূ 'আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি আবুল হাসান তানাফিসী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি 'আব্দুর রহমান মুহারিবী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মক্‌তবের উস্তাদের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন। ❑

মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ : বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির অপরিহার্যতা

–এম. এ মতিন*

বাজেটে প্রতি বছরের মতো এবারও সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পিতভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে শিক্ষাখাত একটি বৃহৎ অংশীদার। শিক্ষাখাতের উন্নয়নের জন্য আবর্তক অর্থ (বেতন-ভাতা) বরাদ্দের অতিরিক্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সামর্থ অনুযায়ী প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত ১ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন। চলতি অর্থ বছরে ৭.৬১, ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা খাতের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮.১৬০ কোটি টাকা। এই ব্যয় প্রস্তাবিত মোট বাজেটের ১৩.৭% এবং জিডিপি'র ১.৮১%। এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ১৭,৬৬৫ কোটি টাকা বেশি। গত বছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭০,৫০৭ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে ১২.০০%। কিন্তু জিডিপি'র ১.৮৩%। তাই টাকার অঙ্কে বাড়লেও শিক্ষায় বরাদ্দের ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেনি। শিক্ষানীতি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১, ইত্যাদি কার্যক্রম সরকারের নিজের এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি দায়ী। স্মর্তব্য, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ যদিও জিডিপির ২ শতাংশের ওপরে ছিল ২০২২-২৩ সালে তা কমে ১.৮৩% হয়। কিন্তু এবার সেটি আরও কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১.৮১% শতাংশে নেমে এসেছে। ইউনেস্কোর পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন অনুযায়ী একটি দেশের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত বাৎসরিক মোট বাজেটের অন্তত ২০% এবং জিডিপি'র ৬%। যাই হোক, সে হিসাবে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে আছে। বাজেটের উপর সংসদে আলোচনা হয়। বিভিন্ন মহল থেকে বাজেট বরাদ্দের উপর মন্তব্য বক্তব্য রাখা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় সম্পাদকীয় ও বিদগ্ধজনেরা বাজেটের পক্ষেবিপক্ষে বক্তব্য দিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আগামী অর্থবছরে এই বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। তার আগে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট-২০২১-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২০ সালে শিক্ষাখাতে মোট জি ডি পি থেকে আফগানিস্তান ৫.৬%, মালদ্বীপ ৫.২%, নেপাল ৪%, ভুটান ৭.৩৬%, শ্রীলঙ্কা ২.২%, পাকিস্তান ২.৬%, ভারত ৩.১%, বাংলাদেশ (২০২০) ২.০৯% অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। লক্ষণীয়, বার্ষিক বরাদ্দকৃত বাজেট বরাদ্দে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের চেয়ে বাংলাদেশ বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। সুতরাং শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো– শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং বেশি বাজেট বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ কেন? শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এই আপ্তবাক্যটি আমাদের সবার কাছে অতি পরিচিত। চিরসত্য এই প্রপঞ্চটি সর্বকালে সর্বযুগে সকল জাতির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। কিন্তু কোন্ সে শিক্ষা যা একটি জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করতে পারে? সে শিক্ষাকে নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্ট কিছু চলক এবং মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। তা না করে যেনতেনভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্বক সার্টিফিকেট বিতরণ করে কেবল ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলে তা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের জন্যে কোনো সুফল বয়ে আনতে পারবে না। উল্লেখ্য, বর্তমান যুগ তীব্র প্রতিযোগিতার যুগ। শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি-বাকরি তথা জীবিকার্জনের জন্য কর্মসংস্থানসহ সব ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা সমানভাবে বিদ্যমান। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক, গবেষকসহ সব পেশাজীবীকে এই প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখে স্ব স্ব কাজে উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই শিক্ষার মান বজায় রাখা প্রতিটি দেশের জন্য অতীব জরুরি। দেশ কত উন্নত হবে অথবা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কতটুকু উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে তা বোঝা যায় শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে। শিক্ষা এবং শিক্ষার মান ও গুণ কথা দু'টির ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল উচ্চারিত শব্দ হলো– 'মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা'। শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করার সাধারণ রীতি যা শুধুমাত্র

* ***উপদেষ্টা,*** *তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা এবং* ***প্রাক্তন পরিচালক,*** *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা।*

শিক্ষিত খেতাবের জন্য কিন্তু একজন সুনাগরিক হিসেবে এবং জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত মানব হিসেবে গড়ে উঠতে গেলে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষার। তাই শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রয়োজন। মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা এমন একটি পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যেন শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। তাই শিক্ষায় এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং স্কুলে প্রদত্ত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সফলতার সাথে সকল প্রতিযোগিতা পেরিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

তদুপরি গুণগত শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলা, সৌজন্যতা, আচরণবিধি, নাগরিক দায়িত্ববোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, সহাবস্থান, অনুসন্ধিৎসু দেশপ্রেমিক, দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, দেশের গুণীজন ও সাধারণ জনগণের প্রতি ভালোবাসাবোধ, দায়বদ্ধতা, অধ্যবসায়সহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্তর্নিহিত গুণাবলী অর্জনে, উন্মোচনে ও আচরণে সহায়তা করে। এ সকল গুণাবলী অর্জন করে তারা কর্মজীবনের জন্য তৈরি হবে এবং বৈশ্বিক পরিবেশে যে কোনো দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সক্ষম হবে। জাতিসংঘের শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কো মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষার অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছে।

গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষার আরও কিছু দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এস জি ডি) অভীষ্ট ৪-এ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে [এম ডি জি (২০০০-২০১৫)] টেকসই রূপদানের লক্ষ্যে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে এস জি ডি ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের ৪ নং লক্ষ্যে গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

৪.১. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৪.২. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা;

৪.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

৪.৪. চাকরি ও শোভনকর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো;

৪.৫. অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারি শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো;

৪.৬. নারী ও পুরুষসহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা;

৪.৭. অপরাপর বিষয়ের পাশাশাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৪.৮. শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা;

৪.৯. উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিসহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো; এবং

৪.১০. শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা। *[সূত্র : জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন]*

এস জি ডি'র উপরোল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বিশেষজ্ঞদের মত হলো– কতগুলো সুনির্দিষ্ট উপাদান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। উপাদানগুলো হচ্ছে– মানসম্মত শিক্ষকের পর্যাপ্ততা, শিক্ষকদের বাজার চাহিদা মোতাবেক পারিতোষিক ও যথাযথ সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি, যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন, মানসম্মত শিখন সামগ্রী ব্যবহার, শিখন-শেখানো পদ্ধতির ও কৌশলের কার্যকর ব্যবহার, নিরাপদ, সকল প্রকার হয়রানিমুক্ত ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ, উপযুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা।

বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সাধ্যমত অর্থ বরাদ্দ করে চলেছে। যে সকল পদেক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পি ই ডি পি-১, ১৯৯৭), দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পি ই ডি পি ২, ২০০৫), মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (এস ই ডি পি, ১৯৯০), ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এ পি, ১৯৯৪), প্রোগ্রাম ফর মোটিভেট, ট্রেইন অ্যান্ড এমপ্লয় ফিমেল টিচার ইন রুরাল সেকেন্ডারি স্কুল (পি আর ও এম ও টি ই ১৯৯৭), মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (এস ই এস ডি পি, ১৯৯৮), ফিমেল স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফ এস এস এ পি. দ্বিতীয় পর্যায়, ২০০১), টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (টি কিউ আই-এস ই পি, ২০০৫), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড একসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এস ই কিউ এই পি, ২০০৮), টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (টি কিউ আই এস ই পি, দ্বিতীয় পর্যায়, ২০১২) এবং হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এইচ ই কিউ ই পি ২০০৯ - ২০১৮) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত)। বলা প্রয়োজন, উপরোল্লেখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থ ও প্রশিক্ষিত লোকবলের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ ব্যতিরেকে গুণগত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও টেকসই করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা মনে রেখেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

এবার আমরা মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর গুণগত দিকের উপর সামান্য আলোকপাত করতে চাই। সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ২/১টি ঘটনা নিবন্ধের উপজীব্য হিসেবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঘটনা– ১ : সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'ক' ইউনিটে স্নাতক ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পাশের হার মাত্র ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। পরীক্ষায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ৯০.৫৭ ভাগ অকৃতকার্য হয়েছে। *[সূত্র : দৈনিক যুগান্তর- ৫ জুন ২০২৩]*

একই ঘটনা একটু বিস্তারিতভাবে বলেছে 'দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ'। তারা "ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ ফেল : দায় কার?" শিরোনামে বলেছেন, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ১, ১৭,৭৬৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর পায় ১১,১০৯ জন। পাসের হার ৯.৪৩ শতাংশ মোট আসন সংখ্যা ১৮৫১টি। 'চারুকলা ইউনিটে' ভর্তি পরীক্ষায় ৪,৭২৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস নম্বর পায় ২১২ জন। পাসের হার ৪.৪৯ শতাংশ। কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১,১৫,২২৩ জন শিক্ষার্থী। পাস নম্বর পায় ১১,১৬৯ জন। পাশের হার ৯.৬৯ শতাংশ। মোট আসন ২,৯৩৪টি। ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩৮,২২৫ জন শিক্ষার্থী। পাস নম্বর পেয়েছে মাত্র ৪, ৫২৬ জন শিক্ষার্থী। পাশের হার ১১.৮৪ শতাংশ। এসব শিক্ষার্থী ন্যূনতম পাস মার্ক ৪০ নম্বরও পায়নি। *[সূত্র : দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ১১ জুন, ২০২৩]*

ঘটনা– ২ : প্রাথমিকে আট হাজার স্কুল বন্ধ, শিক্ষার্থী কমেছে ১৪ লাখ। ২০২২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির (এপিএসসি) তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ যে, এক বছরের ব্যবধানে দেশে প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। করোনাকালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখনক্ষতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, দেশে ৬৫.৫৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর বাইরে প্রাথমিকে আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি করা হয়। সে অনুযায়ী ২০২১ সালে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১,১৮,০০০ এর কাছাকাছি। ২০২২ সালের শুমারিতে এই সংখ্যা ১,১০,০০০ এর নিচে নেমে এসেছে অর্থাৎ- ৭ থেকে ৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর নেই। শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২১ সালের তথ্য নিয়ে করা প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, ২০২১ সালে মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থী আগের বছরের তুলনায় ৬২,১০৪ জন কমেছে। বর্তমানে দেশে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০,২৯৪টি। প্রাথমিক শিক্ষা

অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল দুই কোটি এক লাখের বেশি। যা ২০১৮ সালে ছিল ২ কোটি ৯ লাখ ১৬ হাজার।

উপরে বর্ণিত ২টি ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষার গুণগত মানে ঘাটতি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্ন উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। বাইরে থেকে কোনো প্রশ্ন দেয়া হয়নি। তদসত্ত্বেও অকৃতকার্য্যের সংখ্যা এত বেশি কেন তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়া শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক কোনো ঘটনা নয়। সরকারি তরফে বলা হচ্ছে, এগুলো এনজিও পরিচালিত ও বেসরকারি বিদ্যালয়।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে এর নানাবিদ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্‌রাসা, কারিগরি, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, শিক্ষার সাথে কর্মের দূরত্ব, ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষা বাজেটের অপ্রতুলতা, শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতির বিস্তার, বুলিংসহ যৌন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার এর প্রাধান্য, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, ইত্যাদি বিষয় বহুলাংশে দায়ী। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে গুণগত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষা হতে পারে আনন্দদায়ক, গুণগত মানসম্মত ও টেকসই।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এরইমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন, মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্করণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি পুনর্গঠন, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিংয়ের জন্য কমিটি গঠন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ, মাদ্‌রাসা এবং কারিগরিসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়ন, বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা এবং কল্যাণ ফান্ড প্রদান চালু, ২৯টি বিদেশি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, মাদ্‌রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০,০০০ কম্পিউটার বিতরণ, ২৩,৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় প্রতিদিন গ্রন্থাগার ক্লাশ চালুকরণ ইত্যাদি। এ সকল উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মানের যে ঘাটতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে আমরা লক্ষ্য করলাম তাতে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রতি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে গেলে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্‌রাসার সংখ্যাও নগণ্য নয়। অভাব শুধু গুণগত বা মানসম্মত শিক্ষার। শিক্ষার মান বাড়বে শিক্ষকদের গুণে। শিক্ষার মান উন্নত করতে শিক্ষকের ভূমিকাই সর্বাধিক অগ্রগণ্য। অভিভাবকদের সচেতন করার দায়িত্বও শিক্ষকদের। শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষককে আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষককে দরদী মন নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে নিয়মিত ও যথাযথ পাঠদান ও শিক্ষাদানের সক্ষমতা, কৌশল ও নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করবে শিক্ষার গুণগত মান ও মানসম্মত শিক্ষা। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের নিয়মিত, সুষ্ঠু উন্নত ও পদ্ধতিগত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকতা অন্যান্য পেশার রোল মডেল। একজন শিক্ষক, সমাজ ও জাতি গড়ার কারিগর। সুস্থ স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল দেশ গড়ার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষক। সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রশাসন, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও আধুনিক কারিকুলামের ওপর নির্ভর করে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তথ্য-উপাত্তসহ মানসম্মত পাঠদানের অভিনবত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে শিক্ষার গুণগত মান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাদের সদিচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি ও আন্তরিকতা গুণগত শিক্ষা প্রদানের পূর্বশর্ত। একজন শিক্ষকের জীবনাদর্শ হবে দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। শিক্ষকদের স্বশাসিত হতে হবে। তাড়িত হতে হবে বিবেক দ্বারা। শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনে চমৎকার উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকবে শিক্ষকদের। এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, লক্ষ্যভিত্তিক পাঠক্রম প্রণয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্যে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রেষণার জন্য তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখিত মানের শিক্ষক নিয়োগ করতে পারলে এবং তাঁদের যথাযথ আর্থিক ও সামাজিক প্রেষণা প্রদান করতে পারলে উপরে বর্ণিত ভর্তি পরীক্ষার যে চিত্র আমরা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেছি সেরূপ ঘটনার কথা ভবিষ্যতে হয়তো আর শুনা লাগবে না।

শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মূল্যবোধ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, বিনয় ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার দীক্ষা অবশ্যই আমাদের শিক্ষকদের দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষক কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তিনি সমাজেরও শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নির্ভরতা কমিয়ে মানসিক চাপমুক্ত করতে সহায়তা করা শিক্ষকের একান্ত দায়িত্ব। পরীক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা হারাচ্ছে। পরীক্ষা নির্ভরতা কমিয়ে, মেধা যাচাই করে প্রাথমিক স্তরেই ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম, পরোপকারিতা ও ন্যায়পরায়ণতা শেখানো উচিত। আর একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরীক্ষার ক্ষেত্রে বারবার নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে বা নিয়ম চালু হলে তাতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দুর্বল/অনগ্রসর শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে সহশিক্ষার্থীরা যাতে কখনো খারাপ আচরণ না করে তা নিশ্চিত করে সমতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন ক্লাসে শেষ করতে হবে। তবেই আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

সচেতন, উপযুক্ত, সুনাগরিক এবং বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন একটি পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় পাবে, তেমনি তারা কর্মঠ, উদ্যমী ও স্বাবলম্বী হবে এবং পরিচ্ছন্ন থাকার জ্ঞান লাভ করবে। সে সাথে ট্রাফিক আইন ও তা মেনে চলা এবং যত্রতত্র লিটারিং না করার বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান দান করা জরুরি। আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষকদের ছাত্র শাসনের ব্যাপারে বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করা যাবে না। সেজন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকদের কোমলমতি মন নিয়ে ভালোবাসা দিয়ে যত্নসহকারে পড়াতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের শিক্ষকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে প্রশাসনিক দিক থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজালে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।

শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা পরিবীক্ষণ করা জরুরি। শুধুমাত্র জিপিএ-৫ ও পাশের হার বৃদ্ধি করা নয় শিক্ষার্থীরা কতটুকু কার্যকর জ্ঞান অর্জন করতে পারছে সেটাই মুখ্য বিষয়। বর্তমানে আমাদের অভিভাবকরা জিপিএ-৫ প্রাপ্তিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ফলে তাঁদের সন্তানরা জিপিএ-৫ পেয়েছে কিনা এতেই তাঁদের বেশি মাথাব্যথা। কিন্তু আসলে প্রকৃত শিক্ষা তারা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে সেটা নিয়ে তাঁদের তেমন কোনো দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। অভিভাবকসহ সকলের উচিত শিক্ষার্থীরা স্তরভিত্তিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করতে পারছে তা অনুধাবন করা। নামমাত্র পাশ আর ডিগ্রি সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষিত বেকার তৈরি হয় এমন শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি কখনও বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাই এই বিষয়গুলো শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার চাহিদার পরিবর্তন হয়। বর্তমান যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগ, তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। নকল প্রবণতা বর্তমানে বহুল আলোচিত ওপেন সিক্রেট একটি বিষয়। এছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সার্টিফিকেট জালিয়াতি করার মতো কাজও সংঘটিত হয় বলে পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যে খবর প্রকাশিত হয়। এ সকল অনভিপ্রেত অপকর্ম শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করছে বলে অনেক বিজ্ঞজন মনে করেন।

তদুপরি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মান যথাযথ রাখাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থান এখনও ঈপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এ জন্যে যথাশীঘ্র অনুসন্ধামূলক সমীক্ষা প্রয়োজন এবং সে আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণ করা সময়ের দাবি। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে সম্মানজনক স্থান অর্জন করতে পেরেছে বলে জানা যায়। আর্থ-সামাজিক অনেক চলকে বাংলাদেশ তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে কেন পিছিয়ে আছে তা খুঁজে বের করার সময় এসেছে বলে মনে করি।

সর্বোপরি বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল কল্যাণমুখী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে জনশক্তি উন্নয়ন অপরিহার্য। জনশক্তি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো জীবনমুখী শিক্ষা। এজন্য শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে শিক্ষার পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত মানের দিকে অধিক নজর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ অপরিহার্য। গুণগত শিক্ষা একুশ শতকের একটি অন্যতম চাওয়া। জাতি এই চাওয়া যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ করতে পারবে- দেশ ও জাতি তত শীঘ্রই বৈশ্বিক মাপকাঠিতে স্থান করে নিতে পারবে। ❑

ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান

–অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান

[২য় (শেষ) পর্ব]

৬. রাসূল (ﷺ)-এর যুগের পর হাদীস সংকলন করা অত্যাবশ্যক ছিল : পবিত্র কুরআন একেবারে প্রথম দিন থেকেই মুখস্থ ও লিখিত এই উভয়বিধ পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হয়ে আসছিল।[৪৬] কিন্তু হাদীস শুধুমাত্র মুখস্থ রাখার পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হচ্ছিল। কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটে যাবার আশংকায় মহানবী (ﷺ) নিজেই সকলকে হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন।[৪৭]

মুখস্থ রাখা পদ্ধতি সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। কেননা, হাদীস মুখস্থকারীর মৃত্যুর সাথে সাথে হাদীসের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া মহানবী (ﷺ)-এর ওফাতের পরপর কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ ও পাকাপোক্তভাবে সংকলিত হবার কারণে তখন আর হাদীসের সাথে সংমিশ্রনের ভয় থাকল না। এ সব দিক বিবেচনা করলে একথাই বুঝা যায় যে, মহানবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পঞ্চম খলীফার পূর্বে কেউই এই কাজে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করেননি।

৭. সংগ্রহ ও সংকলনের অভাবে হাদীসের বিলুপ্তির আশঙ্কা : মহানবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংকলনের উপর তাঁর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় সরকারী পর্যায়ে কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনাছাড়া সর্ব সাধারণের স্বউদ্যোগে হাদীস লিখে রাখার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতো না।[৪৮] অন্যদিকে হাফেযদের (মুখস্থ করে সংরক্ষণকারীদের) অতি মাত্রায় শাহাদাতবরণ ও মুত্যুর কারণে বিলুপ্তির আশঙ্কায় কুরআনের চূড়ান্ত সংকলন যেমন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তেমনিভাবে হাদীস সংকলন করাও অতিজরুরি হয়ে পড়ে এবং এ জন্যই পরবর্তীতে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী স্বউদ্যোগে বেসরকারী পর্যায়ে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন।[৪৯] কিন্তু তা সরকারি উদ্যোগে না হওয়ায় কিংবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় পর্যাপ্ত ও যথাযথ হচ্ছিল না। তাই সরকারীভাবে হাদীস সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দেয়। আর এই অতীব প্রয়োজন মেটাতেই পঞ্চম খলীফা এহেন দুরূহ অথচ আবশ্যক একটি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৫০]

হাদীস সংগ্রহ অভিযানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ– ধর্ম ও জাতির চাহিদা পূরণ করতে এবং যুগজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পঞ্চম খলীফা হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যেই ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তাতে তিনি বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তার কয়েকটি বিবরণ দেওয়া হলো।[৫১]

১. হাদীস শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ : হাদীস সংগ্রহের এবং প্রচার ও প্রসারের উত্তম মাধ্যম হচ্ছে হাদীসের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই মর্মে পঞ্চম খলীফাকে দেখছি যে, তিনি তাঁর একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে, আপনি হাদীসবিদ ও বিদ্বানলোকদের আদেশ করুন তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে (তদানিন্তন বিদ্যালয়) জ্ঞানের (হাদীসের) শিক্ষাদান ও তার ব্যাপক প্রচার করেন। কারণ হাদীসের জ্ঞান প্রায় বিলীন হওয়ার পথে।

২. সর্বক্ষেত্রে হাদীসের আনুগত্যের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ : পঞ্চম খলীফা নিজেও হাদীসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের আজ্ঞাবহ ছিলেন।[৫২] তিনি তাঁর অধীনস্ত সকলের প্রতি হাদীসের আনুগত্য করা অপরিহার্য করে দেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেককে উদ্দেশ করে এক ফরমান ঘোষণা করেন : "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের এবং রাসূলের হাদীসের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি।"[৫৩]

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীসকে অগ্রাধিকার দান : পঞ্চম খলীফা হাদীসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

---

[৪৬] *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- পৃ. ১১৯-১২৮।*

[৪৭] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা দ্র.।*

[৪৮] *দেখুন : সুনান আদ্ দারেমী- ইমাম আব্দুল্লাহ দারেমী (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৭ খ্রি.), খণ্ড : ১, পৃ. ১২৭।*

[৪৯] *প্রাগুক্ত; তাহযীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী (কায়রো : হালাবী, ১৯৮৩ খৃ.), খণ্ড : ৪, পৃ. ১৯৮৮।*

[৫০] *ইসলামী বিশ্বকোষ- সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : ই. ফা. বাং), ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায় : 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয।*

[৫১] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মু. আ. রহীম (ঢাকা : ই. ফা. বাং, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪০৩।*

[৫২] *আল খলীফাতুয যাহিদ- পৃ. ২১৫-২১৮।*

[৫৩] *সিয়ার ওয়া আযকার ফিস সিয়ারি ওয়াল আসার রাহমাতুল্লাহ- আব্দুল গানি (রিয়াদ সংস্করণ, ১৪১৭ হি.) খণ্ড : ২, পৃ. ৭৯।*

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কখনো হাদীস পেতেন, সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজের মত পরিহার করে হাদীসের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিতেন। এতে করে সাম্রাজ্যের সবাই হাদীসের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং অগ্রাধিকার দানে উদ্বুদ্ধ হতেন। খলীফার শাসনামলে (৯৯-১০১ হি.) মাখলাদ ইবনু খুফাফ গিফারীর একটি ঘটনা ঘটেছিল। মাখলাদ একটি গোলাম ক্রয় করে বাড়ি নিয়ে আসার কয়েকদিন পর এমন কিছু দোষ ধরা পড়ে যা বিক্রেতা ঐ সময় উল্লেখ করেনি। তাই তিনি খলীফার নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। খলীফা গোলামকে খাদ্য দানের বিনিময় মূল্য ছাড়াই ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। কিন্তু ইত্যবসরেই এই একই প্রসঙ্গে 'আয়িশাহ্ কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (ﷺ)-এর হাদীস তাঁর নিকট পৌঁছে গেল যে, তিনি জামানতের বিনিময়ে বিক্রেতাকে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫৪] অতঃপর কালবিলম্ব না করে খলীফা তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করতঃ হাদীস মোতাবেক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ- গিফারীকে খাদ্যদানের বিনিময় মূল্য (জামানত)সহ বিক্রয় মূল্য গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।[৫৫]

৪. হাদীসের বিপরীতে যে কোনো ধরনের রায়-ক্বিয়াস (যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত) গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ : পঞ্চম খলীফা হাদীসকে শুধু ভালোই বাসতেন না এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাদীসকে অগ্রাধিকারই দিতেন না; বরং হাদীসের বিপরীতে কারো কোনো রায়-ক্বিয়াসকে গ্রহণ করতে জনগণকে নিষেধ করতেন। তাঁর একটি ফরমানে আমরা একথারই স্বীকৃতি পাই। তিনি বলেন : "সাবধান রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের বিপরীতে কারো কোনো রায়-ক্বিয়াস গৃহীত হবে না।"[৫৬]

৫. প্রাথমিকভাবে সবধরনের হাদীস সংগ্রহকরণ : হাদীসবিহীন প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করার কথা চিন্তাও করা যায় না। তাই পঞ্চম খলীফা সিংহাসনে আরোহণ করেই হাদীস সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এজন্য তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট এই বলে নির্দেশ পাঠান :

"আপনারা রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিন এবং সংগ্রহ করে একত্রিত করুন।"[৫৭]

৬. হাদীস যাঁচাই-বাছাই করার জন্য ব্যাপকভাবে হাদীস শাস্ত্র চর্চার নির্দেশ : মহানবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর হিজরি ১ম শতাব্দীর শেষ নাগাদ পর্যন্তও নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীসশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়নি। ইতোমধ্যে অনেক কুচক্রীমহল মহানবী (ﷺ)-এর নামে জাল হাদীস রচনা করতে শুরু করেছিল। লোকেরা কোনটি প্রকৃত হাদীস, কোনটি নয়, তা নির্ণয় করতে হিমশিম খাচ্ছিল। এমনকি অনেক বিদ্বানও এতে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান।[৫৮]

এই মহা সংকট থেকে মুক্তির জন্য দরকার নিয়মিতভাবে ব্যাপকভিত্তিক হাদীস চর্চা। চাই সরকারি-বেসরকারিভাবে অব্যাহত প্রচেষ্টা। এই চাহিদা পূরণের জন্য পঞ্চম খলীফা আবার নির্দেশ দিলেন–

মহানবী (ﷺ)-এর প্রকৃত হাদীস ছাড়া যেন অন্য কিছু গ্রহণ না করা হয়। (অর্থাৎ- হাদীস যাচাই করে নিতে হবে) এবং লোকেরা যেন এই শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা করতে পারে এবং এজন্য নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা নেয়া হোক। যাতে করে (সবার নিকট) ইহা প্রকৃত অর্থে পরিচিত হতে পারে। কেননা, চর্চা বিনেই জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে। (অর্থাৎ- চর্চা অব্যাহত না থাকলে এই শাস্ত্র বিলুপ্ত হতে বাধ্য)।[৫৯]

৭. সরকারী ব্যবস্থাপনায় হাদীস সংকলন করা : খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয সর্বপ্রথম সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এজন্য তদানিন্তন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণকে এ কাজে নিযুক্ত করেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের উপর আলোকপাত করা হলো–

(ক) আবূ বক্র ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাযম : খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীযের শাসনামলে আবূ বক্র ছিলেন মদীনার শাসনকর্তা। যেহেতু সঙ্গত কারণেই মদীনা ছিল হাদীস শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র, তাই খলীফা প্রথমেই এই শাসনকর্তাকে হাদীস সংকলনের দায়িত্বভার অর্পন করলেন। তাঁর নিকট পাঠানো এক ফরমানে খলীফা বলেন : রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস অথবা অনুরূপ

[৫৪] *জামি' আত্ তিরমিযী- আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী (দিল্লী : মুজতবাই প্রেস, ১৩০৮ হি.) খণ্ড : ১, পৃ. ১০৪।*

[৫৫] *বিস্তারিত দেখুন : সুনানুল কুবরা- ইমাম বায়হাক্বী (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা. বি.) খণ্ড : ৫, পৃ. ৩২১-৩২২।*

[৫৬] *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন : ইবনুল কাইয়্যিম (বৈরুত : দারুল জায়ল, ১৯৭৩ খ্রি.) খণ্ড. ২, পৃ. ২৮২।*

[৫৭] *লুবাবুত তাওয়ারীখ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস (লক্ষ্ণৌ : দারুত তাসনীফ, ১৯৬০ খ্রি.) পৃ. ২০৭।*

[৫৮] *সহীহ মুসলিম- মুকাদ্দমা, পৃ. ১৫।*

[৫৯] *বুখারী- খণ্ড : ১, পৃ. ৩৩; ফতহুল বারী- ইবনু হাজার (কায়রো : আল মাতবাআতুল খায়রিয়াহ, ১০৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।*

যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি হাদীস শাস্ত্রের বিলুপ্তি এবং তার ধারক-বাহকদের অন্তর্ধানের আশঙ্কা করছি।[৬০]

(খ) ইমাম যুহরী : হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইবনু শিহাব যুহরীর নাম কে না জানে? বিশেষতঃ উক্ত সময়ে কেউ তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর সম্পর্কে খলীফা নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এই বলে– মহানবী (ﷺ)-এর হাদীস ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে যুহরী অপেক্ষা বড় বিদ্বান আর একজনও জীবিত নেই।[৬১] ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন তিনি হলেন যুহরী।[৬২] খলীফা এই ইমাম যুহরীকে হাদীস সংকলনের জন্য নিয়োগ করলেন। ইমাম যুহরী নিজেই নিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেন : 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয আমাদেরকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ দেন। অতঃপর আমরা হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ লিখে দেই। এরপর তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে একখানি করে গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন।[৬৩]

(গ) সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহ : সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহ ছিলেন সেকালের একজন প্রথিতযশা হাদীসবিদ। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয তাঁকেও হাদীস সংকলনের জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁর নিকট পাঠানো পত্রে তিনি "'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জীবন পরিক্রমা ও যাকাতের বিধি-বিধান" বিষয়ের উপর লিখা আহ্বান করেন।[৬৪] এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তাঁর লিখাটি খলীফার নিকট যখন পাঠালেন তখন একথাও লিখে দিলেন– (মনে রাখবেন) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর আমলে লোকদের মধ্যে যেসব কাজ করেছিলেন, আপনিও যদি আপনার আমলে লোকদের মধ্যে সেসব কাজ করেন, তবে আপনি মহান আল্লাহর নিকট 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র চেয়েও উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন।[৬৫]

৮. খলীফা স্বয়ং নিজেও হাদীস সংকলনের কাজ করেন : হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে খলীফা সমাজের সর্বস্তরে হাদীস চর্চাকে চালু করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করানোর নিমিত্তে তিনি তাঁদেরকেও উৎসাহিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এসবের পাশাপাশি-নিজেকেও একাজে সম্পৃক্ত করেন। সুনানে দারেমীতে উদ্ধৃত একটি ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারি। ঘটনাটি হচ্ছে–

আবূ ক্বালাবা বলেন, একদা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয যোহরের সালাতের জন্য মসজিদে আসলে আমরা তাঁর হাতে কিছু কাগজ দেখতে পেলাম। পরে আবার 'আসরের সালাতের জন্য বের হয়ে আসলেও আমরা তাঁর হাতে ঐ কাগজগুলো দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! এই লেখাগুলো কিসের (উপর)? তিনি বললেন আওন ইবনু 'আব্দুল্লাহ একদা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। এবং তা আমার নিকট খুব পছন্দনীয় (গুরুত্বপূর্ণ) মনে হয়েছিল। তাই আমি তা লিখে নিয়েছি। তার মধ্যে এই হাদীসটিও (যা তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ) রয়েছে।[৬৬]

খলীফার নির্দেশে সংকলিত গ্রন্থসমূহ– আমরা জানি, খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই হাদীস সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তিনি ২ বছর (৯৯-১০১ হিজরি) বেঁচে ছিলেন। তবুও তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার দরুন বহু মনীষী এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জীবনবাজী রেখে হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। আমরা এখানে খলীফার নির্দেশে লিখিত কয়েকটি সংকলনের কথা উল্লেখ করছি–

(ক) ইমাম যুহরীর সংকলন : ইতোপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, ইমাম যুহরী খলীফার নির্দেশ মতো হাদীসের উপর বৃহদাকার গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন।[৬৭] সেগুলো এতই যুগোপযুগী ও চাহিদা মাফিক হয়েছিল যে, খলীফা সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সাম্রাজ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার এক এক খানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে একই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন।[৬৮] এই গ্রন্থগুলোর সুনির্দিষ্ট নাম আমরা জানতে পারিনি।

(খ) ইমাম শা'বীর সুনান : ইমাম শা'বী হাদীসের যেই সংকলন তৈরী করেছিলেন, তা সুনান নামে পরিচিত।

---

[৬০] *প্রাগুক্ত।*
[৬১] *তারীখুল খুলাফা- পৃ. ৪০১।*
[৬২] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০২।*
[৬৩] *প্রাগুক্ত- ৪০১।*
[৬৪] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- পৃ. ৩৯৯।*
[৬৫] *তারীখুল খুলাফা- পৃ. ৪১।*
[৬৬] *আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া- ইবনু কাসীর (কায়রো দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি.), খণ্ড : ৯, পৃ. ৯৩।*
[৬৭] *প্রাগুক্ত- ৪০১।*
[৬৮] *প্রাগুক্ত।*

ইমাম শা'বী তখন কুফার কাযী (বিচারক) ছিলেন। তিনি একই বিষয়ের উপর বর্ণিত সকল হাদীস একই স্থানে একত্রিক করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৬৯]

(গ) ইমাম মাকহুলের সুনান : খলীফার নির্দেশে ইমাম মাকহুল যেই সংকলন তৈরি করেন তা "কিতাবুস্ সুনান" নামে পরিচিত।[৭০]

(ঘ) আবূ বক্র ইবনু হাযম-এর সংকলন : মদীনার তদানিন্তন শাসনকর্তা আবূ বক্র ইবনু হাযম হাদীস সংগ্রহ করেন এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থগুলো খলীফার নিকট পৌঁছার পূর্বেই খলীফা ইন্তেকাল করেছিলেন।[৭১] আমরা তাঁর গ্রন্থগুলোর সুনির্দিষ্ট নাম জানতে পারিনি।

(ঙ) সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহর রিসালাহ : খলীফার নির্দেশে সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যাকাত-সাদাক্বাহ্ সম্পর্কিত বিষয়ে গৃহীত বিধি-বিধান শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন তৈরি করে খলীফার নিকট পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই সংকলনটি রিসালাহ নামে পরিচিত ছিল।[৭২]

(চ) রুবাই ইবনু সুবাইহ-এর সংকলন : রুবাই খলীফার নির্দেশে একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। তিনি হাদীসগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৭৩]

(ছ) সা'দ ইবনু আবূ আরুবা-এর সংকলন : খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয-এর নির্দেশ পেয়ে সা'দ ইবনু আবূ আরুবাও একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটিতেও পৃথক পৃথক অধ্যায়ে হাদীসগুলো সাজানো হয়েছিল।[৭৪] রুবাই ও সা'দ-এর সংকলন দ্বয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে হাদীস শাস্ত্রবিদ ইবনু হাজার আসকালানী বলেন :

পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সাজিয়ে হাদীসের সংকলন সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন রুবাই ইবনু সুবাইহ, সা'দ ইবনু আবূ আরুবা এবং অন্যান্যরা।[৭৫]

ইত্যাকার অনেক গ্রন্থ সে সময়ে রচিত হয়েছিল।[৭৬] আমরা যতদূর জানি, এসব গ্রন্থের মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থ পরবর্তীদের হাতে পৌঁছেনি। অথবা ঐ সব সংগ্রহ পরবর্তীগণ ধরে রাখতে পারেনি। বাকী সব গ্রন্থের হাদীসগুলো বর্তমানে প্রাপ্ত হাদীস গ্রন্থসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে অধিভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত হয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার : এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, ইসলামের ৫ম খলীফা হিসেবে পরিচিত 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ইসলামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব ও সার্থক রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উমাইয়া খলীফাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। উমাইয়াহ্ খলীফাদের সম্পর্কে ইতিহাসের যে বিরূপ মন্তব্য আছে, তার সাথে এই খলীফার বিন্দু-বিস্বর্গ সম্পর্কও নেই। তিনি সীমাহীন প্রতিকূল অবস্থাকে অসম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। তিনি তাঁর জীবনকে জ্ঞানান্বেষণে ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। জাতির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি জাতির মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছেন।

মুসলিম জাতীয় জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন পঞ্চম খলীফার জীবনের অনন্য অবদান। তিনি এর জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সকল বিদ্বানকে হাদীস শাস্ত্রের অথৈ সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণের জন্য উৎসাহ, পরামর্শ ও নির্দেশ দান করেন। ফলে হাদীস সংগ্রহ অভিযান শুরু করার অত্যাল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হলেও অভিযান থেমে থাকেনি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে বহু হাদীস বিশারদ এ মহান কাজে জীবন উৎসর্গ করে অসংখ্য বড় বড় হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আর এ জন্যই ইসলামের ইতিহাস তাঁকে ইসলামের (প্রথম শতকের) প্রথম মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে আখ্যায়িত করেছে।[৭৭]

আমরা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের উত্তম আদর্শগুলো গ্রহণ করতে পারি। হাদীস শাস্ত্রের চর্চায় তাঁকে আদর্শরূপে মেনে নিতে পারি। তাঁর কর্ম থেকে আমরা আমাদের কর্মপ্রেরণা লাভ করতে পারি। ❑

---

[৬৯] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- পৃ. ৪০৫।*
[৭০] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০৫, ৪০৬।*
[৭১] *তাযকিরাতুল হুফফায- শামসুদ্দীন আযযাহাবী (কায়রো : দারু ইহাইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, তা. বি.), খণ্ড : ১, পৃ. ১০৭।*
[৭২] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- পৃ. ৪০৫, ৪০৬।*
[৭৩] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০৬।*
[৭৪] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০৬।*
[৭৫] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪০৬।*
[৭৬] *তাযকিরাতুল হুফফায- খণ্ড : ১, পৃ. ১০৭, ১০৮।*
[৭৭] *আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া- খণ্ড : ৯, পৃ. ৯৪।*

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

আল কুরআনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে খাযির (আলাইহিস সালাম) সাক্ষাত। খাযির (আলাইহিস সালাম)-কে? তিনি নবী ছিলেন, না ওলী ছিলেন, তিনি কি বেঁচে আছেন কি বেঁচে নেই এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কুরআনে তাকে ﴿عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾ "আমাদের বান্দাদের একজন" বলা হয়েছে।[৭৮]

সহীহুল বুখারীতে তার নাম খিযির (خضر) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হলো, খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর বক্তব্য–

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ﴾

"আমি এসব নিজের মতে করিনি।"[৭৯]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন এইভাবে–

﴿وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ○ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۖ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۖ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ★ عَجَبًا ○ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ★ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ○ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ○ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ○ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ○ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ○ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ○ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ○ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ★ ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ۭ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾

স্মরণ করো, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দু' সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' তারা উভয়ে যখন দু' সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল তারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলে গেল; সেটা সুড়ঙ্গের মতো নিজের

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৭৮] *সূরা আল কাহফ : ৬৫।*

[৭৯] *সূরা আল কাহফ : ৮২।*

পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যখন তারা আরো অগ্রসর হলো মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই সেটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।' মূসা বলল, 'আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাকে বলল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না, 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে?' মূসা বলল, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।' সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি যেহেতু আমার অনুসরণ করবেনই কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।' অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে সেটা বিদীর্ণ করে দিলো। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবার জন্য সেটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!' সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?' মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? মূসা বলল, 'এরপর, যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তাকে সুদৃঢ় করে দিলো। মূসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এটার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' সে বলল, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। 'নৌকাটির ব্যাপারে–এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত। 'আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফ্‌রীর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। 'অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে এর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। 'আর ঐ প্রাচীরটি, এটা ছিল নগরবাসী দু' পিতৃহীন কিশোরের, এটার নিম্ন দেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।"[৮০]

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও খাযিরের এ ঘটনাটি হাদীসেও বিস্তারিতভাবে এসেছে : যেমন- সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, নাওফুল বিকালী বলে থাকে খাযিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী মূসা বানী ইসরাঈলের মূসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন না। একথায় ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আল্লাহর দুশমন মিথ্যে কথা বলছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে

[৮০] *সূরা আল কাহফ : ৬০-৮২।*

বলতে শুনেছেন, মূসা (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলদের মাঝে ওয়াজ করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রুষ্ট হলেন। কারণ, জ্ঞানের বিষয়টি তিনি মহান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওয়াহীর মাধ্যমে বললেন, দু' সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা অবস্থান করছে, সে তোমার চেয়ে বেশি জানে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার রব! আমি তাঁর কাছে কেমন করে পৌঁছতে পারি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, একটা মাছ সঙ্গে নাও এবং সেটা থলির মধ্যে রাখো। যেখানে সেটাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি একটা মাছ নিলেন। সেটা থলিতে রাখলেন তারপর চলতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে ইউশা' ইবনু নূন নামক এক যুবকও ছিলেন। তারা সমুদ্র কিনারে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার ওপর মাথা রেখে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলির মাঝে লাফিয়ে উঠলো। থলি থেকে বের হয়ে সেটা সমুদ্রের পানিতে চলে গেলো। আর যেখান দিয়ে মাছটি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা সেখানে সমুদ্রের পানির চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেলেন। সে দিনের বাকি সময় ও সে রাত তাঁরা চললেন। পরের দিন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন : এ ভ্রমণে বেশ ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, এখন আমাদের আহার আনো।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আসলে আল্লাহ তা'আলা যেস্থানে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন সে স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় থেকেই মূসা (আলাইহিস সালাম) ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বললেন : আপনার মনে আছে যে, শিলাখণ্ডের পাশে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, সেখানেই মাছটি বিস্ময়করভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি মাছটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে শয়তান আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনাকে তা জানাতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মাছটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিল তার পথ বানিয়ে। মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর খাদিমকে (ইউশা' ইবনু নূন) তা আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন এটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। কাজেই তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সে স্থানে ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তাঁরা উভয়ে নিজেদের পদরেখা অনুসরণ করতে করতে পূর্বের শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে খাযির (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, তোমাদের এ দেশে সালামের প্রচলন হলো কোথা থেকে? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি মূসা। (খাযির জিজ্ঞেস করলেন :) বানী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বানী ইসরাঈলের নবী মূসা। আমি এসেছি এজন্যে যে আপনি আমাকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেবেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি (খাযির) উত্তর দিলেন, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না। হে মূসা! আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান তুমি পাওনি। আল্লাহ তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেন, এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান আমিও পাইনি। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন : ইন্‌শা-আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন এবং আমি আপনার কোনো হুকুমের বিরুদ্ধে যাব না। খাযির (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন : যদি তুমি আমার সঙ্গে চলতে চাও তাহলে আমাকে কোনো কথা প্রশ্ন করো না যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে তা না বলি। কাজেই তারা দু'জন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা সমুদ্র কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। তাদেরকে নৌকায় করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নৌকার মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খাযির (আলাইহিস সালাম)-কে চিনতে পারলো। তাই তাদেরকে বসিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে গেলো কিন্তু এর বিনিময়ে কোনো মূল্য নিলো না। যখন তারা উভয়ে নৌকায় চড়লেন, খাযির কুড়াল দিয়ে নৌকার একটা তক্তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, এরা তো বিনা মজুরিতে আমাদেরকে বহন করলেন। অথচ আপনি এদের নৌকাটির ক্ষতি করলেন। আপনি নৌকাটা ফাটিয়ে দিলেন আরোহীদের ডুবিয়ে দেবার জন্য। আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করলেন। খাযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি কি আগেই তোমাকে বলিনি, আমার সঙ্গে চলার ব্যাপারে তুমি কোনো ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা বললেন, আমি যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর

আমার ব্যাপারে খুব বেশি কঠোরতা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রথমবার ভুলে গিয়েই এটা করেছিলেন। এরপর আসলো একটা চড়ুই পাখি। পাখিটা বসলো নৌকার এক পাশে। ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র হতে এক বিন্দু পানি পান করলো। এ দৃশ্য দেখে খাযির (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন, এ চড়ুইটা সমুদ্র হতে যতটুকু পানি খসালো, আমার ও তোমার জ্ঞান মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই। তারপর তাঁরা নৌকা ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীর ধরে তাঁরা হাঁটতে লাগলেন। পথে খাযির দেখলেন, একটি বালক অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে। তিনি হাত দিয়ে বালকটিকে ধরলেন। দেহ থেকে তার মাথাটা পৃথক করে দিলেন। তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, আপনি একটা নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে পূর্বেই বলিনি যে, আমার সাথে তুমি সবর করে চলতে পারবে না। (বর্ণনাকারী) বলেন : এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওযর পেলেন। পরে তারা সম্মুখের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকদের কাছে খাদ্য চাইলেন। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (বর্ণনাকারী) বলেন, দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির (আলাইহিস সালাম) দাঁড়ালেন। নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এ বসতির লোকদের নিকট আমরা আসলাম, খাদ্য চাইলাম, তারা আমাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো। আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। (অথচ আপনি তা করলেন না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিলেন)। খাযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, ব্যাস, এখান থেকে তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। এখন আমি তোমাকে সে বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবো যেগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি। (সে নৌকাটির ব্যাপার এ ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকটা গরীব লোক। সমুদ্রে শরীর খেটে তারা জীবন ধারণ করতো। আমি নৌকাটাকে দোষী করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটা নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। তারপর সে বালকটির কথা। তার বাপ-মা ছিল মু'মিন। আমরা আশঙ্কা করলাম ছেলেটি তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেবে। তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক স্নেহ ও দয়ার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উন্নত হবে। আর এ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, এটা হচ্ছে দু'টো ইয়াতীম বালকের তারা এ শহরে বাস করে। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য ধন-সম্পদ লুকানো রয়েছে। তাদের পিতা ছিলেন সৎ ব্যক্তি। তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলে দু'টি বড় হয়ে তাদের জন্য রাখা ধন-সম্পদ লাভ করবে। তোমার প্রতিপালকের মেহেরবানীর কারণে এটা করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করিনি। এ হচ্ছে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি সবর করতে পারোনি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ভালো হতো যদি মূসা আরো একটু সবর করতেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আরো কিছু কথা আমাদের অবগত করাতেন।

সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পড়তেন "ওয়া কানা আমামাহুম মালিকুন ইয়াখুযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবা" আর তাদের সম্মুখে ছিল এমন এক রাজার এলাকা, যে সব নিঁখুত ও ভালো নৌকা কেড়ে নিতো। অর্থাৎ- তিনি "ওয়ারা-'আহুম"-এর জায়গায় পড়তেন "আমামাহুম" আর সাফীনাতিন এর সাথে পড়তেন "সাফীনাতিন সলিহাতিন" আর ওয়া আম্মাল গুলামু-এর পরে পড়তেন "ফাকানা কাফেরান ওয়াকালা আবাওয়াহু মু'মিনাইনি।"[৮১]

শিক্ষা :

১. আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনই একমাত্র জ্ঞানের উৎস।

২. তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন। যেমনটি তিনি খাযির (আলাইহিস সালাম)-কে তার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। ❑

[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭২৫।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

পীর বা আমীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমাদের সমাজে একশ্রেণির পীর এবং কোনো দল বা সংগঠনের আমীর তাদের মুরিদ বা অনুসারীদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। তাদের এই বাইয়াত গ্রহণ আদৌ কি শরিয়তসম্মত? মূলত তারা যে হাদীসের আলোকে তাদের মুরিদ বা অনুসারীদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছেন, সেই হাদীস দ্বারা আদৌ কোনো পীর কিংবা তথাকথিত আমীরকে বুঝানো হয়নি; বরং যারা না বুঝে এরূপ বাইয়াত গ্রহণ করছেন, তারা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ছে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো–

বাইয়াত শব্দটি ক্রিয়ামূল। البيع ও البيعة একই অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ অর্থে التَّبَايُعُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ সবের অর্থ হলো– বেচাকেনামূলক চুক্তি করা, শাসক বা খালীফার আনুগত্যের চুক্তি করা ইত্যাদি।[৮২]

ইসলামী শরিয়াহ মূলতঃ বাইয়াত হলো খালীফাহ বা শাসক নির্বাচনে মুসলিমগণের প্রধান অংশের পরামর্শে শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ এবং জনগণের কল্যাণকামী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক খালীফাহ্ বা শাসকের আনুগত্যের অঙ্গীকার চুক্তি।[৮৩]

ইসলামী শরিয়ার আলোকে বাইয়াত দু’প্রকার। যথা-

১. بيعة الانعقاد **:** তা হলো জ্ঞানীগুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আমীর/সুলতান/খালীফার আনুগত্য, সহায়তা ও মেনে চলার অঙ্গীকার। খুলাফায়ি রাশিদীনের সময়ে এ বাইয়াতের উজ্জ্বল নমুনা রয়েছে। সকীফা বানু সায়িদাতে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র কাছে বিশিষ্ট সাহাবীগণ বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। খলীফাগণের বাইয়াত শরিয়াত সিদ্ধতার ঘোষণা স্বয়ং বিশ্বনবী (ﷺ) স্পষ্টভাবে দিয়ে গেছেন। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন–

«كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وإِنَّه لَا نَبِيَّ بعدِيْ وسيكون حلفاء فَيَكْثُرُوْنَ» قَالُوْا : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : «فُوْا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا استرعاهم».

“বানী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই। অবশ্য খালীফাহ হবেন এবং তারা হবেন অনেক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! তখন আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি (ﷺ) বললেন : প্রথমজনের পর (পরবর্তী) প্রথমজনের বাই‘আত পূর্ণ করবে। তাদের হক্বগুলো আদায় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন– তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে।”[৮৪]

২. البيعة العامة **(সর্ব সাধারণের আনুগত্যের বাইয়াত) :** এ বাইয়াত হলো বিশিষ্টজনের বাইয়াত গ্রহণের পর সর্ব সাধারণের পক্ষ থেকে খালীফাহ বা আমীরকে মেনে চলার বাইয়াত। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিশিষ্ট সাহাবীগণ কর্তৃক বিশেষ বাইয়াতের মাধ্যমে খালীফাহ নির্বাচিত হওয়ার পর দিন মাসজিদে নাববীর মিম্বারে উঠে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা জ্ঞাপন ও বিশেষ বক্তব্যের পর বললেন,

«اَطِيْعُوْنِيْ مَا اَطَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَا طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكُمْ».

“আল্লাহ তা‘আলা এবং তদীয় রাসূল-এর আনুগত্য আমি যতটা করব তোমরা আমাকে মেনে চলবে, আর যদি আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল-এর নাফরমানী

[৮২] *লিসানুল আরব- ইবনু মানযূর, ৮/২৬।*
[৮৩] *আল খিলাফাহ- আল্লামা মুহাম্মদ রশীদ রিযা, পৃ. ২১-২২।*
[৮৪] *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত- হা. ৩৫০৬, ৩৬৭৫/১৫।*

করি তাহলে আমাকে মান্য করা তোমাদের করণীয় থাকবে না।"[৮৫]

কিছু কিছু ইসলামী দল বা সংগঠনের আমীর যে বাইয়াত নিচ্ছেন তা ইসালামী শরিয়াতসম্মত আদৌ নয়। এ প্রসঙ্গে শাইখ সালিহ আল-ফাওযান বলেন,

«اَلْبَيْعَةُ لَا تكونُ إِلَّا لِوَلِّيِّ اَلْاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَهَذِهِ الْبَيْعَةَ الْمَتَعَدَّدَة مُبْتَدِعَةٌ وَهِيَ من افرَا داتِ الْاَ خْتِلَافِ».

"মুসলিমগণের শাসক ছাড়া আর কারো জন্য বাইয়াত হবে না। অন্যসব বাইয়াত বিদআত, এটি বিভেদ বিচ্ছিন্নতার খণ্ড অংশ।"[৮৬]

প্রকৃতপক্ষে বাইয়াত খালীফাহ বা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের জন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্ধারণ করেছেন। একজন খালীফার বর্তমানে অন্যজন বাইয়াত নিতে পারে না। আর তা করলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করতে হবে। আর এ হত্যার হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র খালীফাহ বা শাসকই সংরক্ষণ করবে। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوْا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

"যদি দু'জন খালীফার জন্য বাইয়াত চাওয়া হয় তাহলে তাদের দ্বিতীয় দাবিদারকে হত্যা করবে।"[৮৭]

সুতরাং খালীফাহ বা রাষ্ট্র শাসনকারী আমীর ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ শরিয়তসম্মত নয়। ইমাম বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

«وَلَا اَعْلَمُ فِيْ الشَّدعِ الْمُطَّهَّرِ بَيْعَة لِغَيْرِ وَلَاةِ الْأُمُوْرِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَعَلَى اِيْبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».

"পবিত্র শরিয়তে শাসক ভিন্ন অন্য কেউ শুনার, মানার এবং কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণের বাইয়াত গ্রহণের বিষয় আমি জানি না।"[৮৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের সমাজের একশ্রেণির মানুষ নিজের নেতৃত্ব কায়েমীর স্বার্থে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে একটি গ্রাম বা মহল্লায় যদি একাধিক আলেম পীর বাইয়াত নেয়া শুরু করেন, তবে সে সমাজে ফিতনা কীরূপ ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অতএব, ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেনো নিজস্বার্থ চরিতার্থের জন্য আমাকে ব্যবহার করতে না পারে। ❑

দু'আর আবেদন

০১. যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী অপারেশন পরবর্তী ঢাকার ধানমণ্ডিতে ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার পূর্ণ আরোগ্যের জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় দফতরের হিসাব রক্ষক ইয়ামিন হুসাইন অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারী পরবর্তী বাসায় চিকিৎসাধীন আছেন। তার পূর্ণ আরোগ্যের জন্য জমঈয়ত দফতর থেকে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়ার সাবেক ও প্রবীণ শিক্ষক শাইখ শফিকুর রহমান বিন রেজাউল্লাহ আল মাদানী (রাজশাহী) গত ৩০ জুন শুক্রবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় মৃত্যুবরণ করেছেন- "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০২. দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদস্য আলহাজ্জ এ. এস. এম সাইফুদ্দিন সরকার (৯৬) গত ১৫ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ০১.৩০টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্ত্রী ০৪ ছেলে ও ০১ মেয়ে রেখে যান। জানাযা সালাতে ইমামতি করেন চিরিরবন্দর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মওলানা মো. ইয়াকুব আলী সালাফী। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য দিনাজপুর জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে।

---

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল বাইয়াত, ৪/১৬৫।*
[৮৬] *মুন্তাকা লিফাতওয়া- সালিহ আল-ফাওযান, ১/৩৬৭ পৃ.।*
[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬১/১৮৫৩, মিশকাত- ৩৫০৭, ৩৬৭৬/১৬।*
[৮৮] *আল মাউকাউর রসমী লি সামাহাতিল ইমাম বিন বায- সূত্র : ইন্টারনেট।*

সমাজচিন্তা

বিবাহ ও উকিল বাবা প্রসঙ্গ

–আবু মুহান্নাদ

আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বিবাহের সময় কনের অভিভাবকের পক্ষ একজন উকিল বাবা কিংবা উকিল মাতা নিয়োগ করা হয়। এ সম্পর্কিত শরিয়তের বিধান কী? নিম্নে এ বিষয়ে হাদীস ও ফকিহগণের মতামতের আলোকে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হলো–

উকিল (الوكيل) শব্দটি আরবি। এর অন্যতম একটি অর্থ হলো– প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। আর আমাদের সমাজে "বিয়েতে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি নিয়ে বরকে জানায় তাকে উকিল বলা হয়।"[৮৯]

অন্য কথায় কনের অভিভাবকের নির্দেশ বা অনুমতি সাপেক্ষে তার পক্ষ থেকে বিয়ের ইজাব-কবুলের জন্য অন্য কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উপযুক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করলে তাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে 'উকিল' বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই উকিল বানানোর বিধান কি আমরা নিম্নে সে বিষয়টি আলোচনা করব ইন্‌শা-আল্লাহ।

কনের বিয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো– তার পিতা অভিভাবক হিসেবে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ- পিতা নিজে ইজাব-কবুলের বিষয়টি সম্পন্ন করবে। কিন্তু পিতার অনুপস্থিতিতে বা অপারগতায় তার সবচেয়ে নিকটস্থ ব্যক্তিগণ পর্যায়ক্রমে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে। যেমন- এ ক্ষেত্রে পিতার অনুপস্থিতি বা অপারগতায় দাদা, অতঃপর সন্তান (স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা নারীর ক্ষেত্রে), অতঃপর ভাই, অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর চাচা, অতঃপর মামা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবে। এটাই সবচেয়ে উত্তম।

একান্তই যদি উপরোক্ত আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে দেশের মুসলিম শাসক বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা (যেমন- আদালত) বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে।

কিন্তু আমাদের সমাজে সাধারণতঃ মেয়ের পিতা (বা অভিভাবক) নিজে বিয়ের দায়দায়িত্ব পালন না করে তার পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে উকিল (দায়িত্বশীল বা প্রতিনিধি) নিয়োগ দেন। আর সে ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বিয়েতে ইজাব-কবুলের দায়িত্ব পালন করে।

এটা অনেক সময় করা হয়, অভিভাবকের এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে, অনেক সময় রোগ-ব্যাধি বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে, অনেক সময় অভিভাবক প্রবাসে বা দূরে কোথাও অবস্থানের কারণে অথবা কোন সমস্যা না থাকার পরও শুধু সামাজিক নিয়ম হিসেবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে এই উকিল নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টিকে হারাম বলার সুযোগ নেই। কারণ ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি ও বিভিন্ন লেনদেনের ক্ষেত্রে উকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ দেওয়া একটি সুবিদিত ও ব্যাপক প্রচলিত বৈধ নিয়ম। সুতরাং বিয়ের মতো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রেও এই উকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ বৈধ। ইবনুল কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"বিয়ের ইজাব-কবুলের ক্ষেত্রে উকিল বানানো জায়িয। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তার বিয়ে কবুলের জন্য উকিল বানিয়েছিলেন। কারণ এর প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় এমন দূরে বিয়ে করার প্রয়োজন হতে পারে যেখানে সফর করা সম্ভব নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন উম্মে হাবিবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি [উম্মে হাবিবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] হাবাশায় (ইথিওপিয়ায়) অবস্থান করছিলেন।"[৯০]

তিনি আরও বলেন, "বিয়েতে উকিল (প্রতিনিধি) বানানো জায়িয-চাই ওলী (অভিভাবক) উপস্থিত থাকুক অথবা অনুপস্থিত থাকুক, তা বাধ্যগত অবস্থায় হোক অথবা না হোক। কারণ বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে তার বিয়ের সময় আবূ রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং উম্মে হাবিবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করার সময় 'আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (তার পক্ষ থেকে) উকিল (প্রতিনিধি) বানিয়েছিলেন।"[৯১]

শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"বিয়েতে অভিভাবক তার পক্ষ থেকে উকিল (প্রতিনিধি) হিসেবে অন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন- কনের বাবা তার পক্ষ থেকে কনের

[৮৯] *দ্রষ্টব্য : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- পৃ. ১৪৭।*

[৯০] *আল মুগনি- ৫/৬৪।*

[৯১] *আল মুগনি- ৭/১৯।*

মামাকে অথবা তার দিক নির্দেশনা দেওয়ার উপযুক্ত কোনো ছেলেকে উকিল বানাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তার মেয়ে, বোন কিংবা ভাতিজির বিয়েতে দিক নির্দেশনা দেওয়ার উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে উকিল দিতে পারে। যেমন- দিক নির্দেশনা দেওয়ার উপযুক্ত তার মামা, ভাই বা চাচাকে উকিল বানানো।"

তিনি আরও বলেন, "অনুরূপভাবে স্বামীও তার পক্ষ থেকে বিয়েতে উকিল দিতে পারে। স্বামী নিজেই তার পক্ষ থেকে বিয়েতে কবুল বলার জন্য যে কাউকে উকিল বানাতে পারে। সে তার বাবা বা ভাইকে উকিল বানাতে পারে। উক্ত মহিলাকে বিয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কবুল বলবে। এভাবে বলবে যে, আমি আমার অমুক ভাই, চাচা অথবা ভাতিজা বা ছেলের পক্ষে থেকে এই বিয়েতে কবুল করলাম। এতে অসুবিধা নেই। মেয়ের অভিভাবক কিংবা স্বয়ং বরের পক্ষ থেকে উকিল বানানো জায়িয।

উপস্থাপক : তার (অভিভাবকের) উপস্থিতিতেই কি উকিল বানানো যাবে?

শাইখ : তার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায়।

সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ডও অনুরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেছে। তাছাড়া উকিল বানানো আমাদের সমাজের বহুল প্রচলিত একটি দেশাচার ও প্রচলিত রীতি। আর দেশ আচার ও সামাজিক রীতি-নীতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম বলা যাবে না যতক্ষণনা তাতে হারামের সংমিশ্রণ ঘটে। অর্থাৎ- তার সাথে যে হারাম বিষয়টি যুক্ত হবে সেটা পরিত্যাজ্য হবে।

সুতরাং উকিল (বা দায়িত্বশীল বা প্রতিনিধি) নিয়োগ দেওয়া জায়িয। একে হারাম বা বিদআত বলার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে এ বৈধ বষয়টিকে কোনো কোনো আলেম বা বক্তা জোর গলায় হারাম বলে ফাতাওয়া দিয়ে চলেছেন-যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

উকিল বাবা-মা'র ক্ষেত্রে কী জায়িয আর কী জায়িয নয় : বর অথবা কনের পক্ষ থেকে সম্মানের উদ্দেশ্যে উক্ত পুরুষ উকিলকে 'উকিল বাবা' এবং তার স্ত্রীকে 'উকিল মা' বলে সম্বোধন করায় কোনো দোষ নেই। কারণ সম্মানের উদ্দেশ্যে যে কোনও বয়স্ক, মুরব্বি ও সম্মানিত ব্যক্তিকে বাবা এবং মহিলাকে মা বলে সম্বোধন করা জায়িয আছে।

অনুরূপভাবে সামাজিক সম্পর্কের খাতিরে তাদেরকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দেওয়া, ঈদ, বিয়ে, 'আক্বিক্বাহ্ ইত্যাদি নানা উপলক্ষে তাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো, একে অপরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি সবই জায়িয।

তবে যা জায়িয নয় তা হলো– অনেক স্থানে দেখা যায়, বিবাহিত মেয়েটি উক্ত 'উকিল বাবা'র সাথে নিজের জন্মদাতা বাবার মতো এবং বিবাহিত ছেলেটি তার স্ত্রী বা উকিল মা'র সাথে জন্মদাত্রী মায়ের মতো আচরণ করে। তারা একসাথে বেপর্দা অবস্থায় থাকে, পর্দাহীন অবস্থায় একে অপরকে দেখাদেখি করে, এ অবস্থায় পাশাপাশি বসে খোশ গল্প করে, খাওয়া-দাওয়া করে ও তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে। অনেক সময় তাদের শরীর, হাত-পা ইত্যাদি স্পর্শ করে। অনেক সময় একাকী ঘরে অবস্থান করে বা দূর সফরে যায়। মোটকথা, তারা উক্ত উকিল বাবা বা মার সামনে পর্দা করার প্রয়োজনই অনুভব করে না।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো সম্পূর্ণ হারাম এবং গুনাহের কাজ। উকিল বাবা-মা যদি নন মাহরাম কেউ হয় তাহলে তারা নন মাহরামই থাকবে। এই উকিল বাবা-মা হওয়ার কারণে তারা কখনো মাহরাম বলে গণ্য হবে না।

সুতরাং ছেলে বা মেয়ের জন্য তাদের সাথে সর্বাবস্থায় পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা ফর্‌য।

অতএব এ বিষয়ে আমাদের সমাজের সচেতন ও সাবধান হওয়া জরুরি। এই ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা, দাঈ, বক্তা, মসজিদের ইমাম, খতিব, ইসলামিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সর্বস্তরের দ্বীনদার সচেতন মানুষের দায়িত্ব মানুষকে হালাল-হারাম বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করা এবং হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে সচেতন করা। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন –আমিন।

সারাংশ : কনের বিয়েতে তার পিতা বা অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সবচেয়ে উত্তম। তবে অভিভাবক চাইলে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য উকিল নিয়োগ দিতে পারে। শরিয়তে এটা জায়িয রয়েছে– যা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত এবং সম্মানিত আলেমগণ এ ব্যাপারে বৈধতার ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

সম্মানের উদ্দেশ্যে উকিল বাবা বা মা বলে সম্বোধন করায় এবং তাদেরকে বিভিন্ন সময় উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি লেনদেন করায় কোনো দোষ নেই।

তবে নন মাহরাম ব্যক্তি উকিল হলে এতে সে মাহরাম হয়ে যায় না। সুতরাং তার সামনে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা আবশ্যক। ❑

বিস্ময়-বৈচিত্র্য

ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু

–মো. হারুনুর রশিদ★

[পর্ব– ০৩ (শেষ)]

৪. যে ৪ আচরণ ক্বলবের জন্য বিষের মতো ক্ষতিকর : বিষ যেমন মানুষের জন্য ক্ষতিকর তেমনি এমন ৪টি আচরণ আছে যা ক্বলবের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যা মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। পরিণামে মানুষের দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ বরবাদ হয়ে যায়। তাই এ আচরণগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

আচরণগুলো কী?

মানুষের যে আচরণগুলো ক্বলবের জন্য ক্ষতিকর; এর দু'টি এসেছে হাদীসে আর দু'টি এসেছে কুরআনে। ক্বলবের ক্ষতি থেকে বাঁচতে আচরণ ৪টি তুলে ধরা হলো–

১. অহেতুক কথাবার্তা : সব সময় কথাবার্তায় সংযত থাকা। কারো সঙ্গে অসংযত কোনো কথা না বলা। এমন কোনো কথা না বলা; যে কথা মানুষের অন্তর কুলষিত হয়। ক্বলব নষ্ট হয়ে যায়। হাদীসে পাকে এসেছে–

নবীজী (ﷺ) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির ঈমান স্থির হবে না, যদি তার ক্বলব স্থির না হয়। আর তার ক্বলব স্থির হবে না, যদি তার জিহ্বা স্থির না হয়।'[৯২]

২. অসংযত নজর : সব সময় নিজেদের দৃষ্টিকে হিফাযত করা। দৃষ্টি খারাপ হয়ে গেলেই মানুষের ক্বলব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দৃষ্টির কুপ্রভাব ক্বলবের ওপর পড়ে। তাই মু'মিনদের উচিত দৃষ্টির হিফাযত করা। যেভাবে দৃষ্টির হিফাযত করতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ﴾

'(হে নবী! আপনি) মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করে। এটি তাদের পবিত্র থাকার জন্য অধিক সহায়ক। তারা যা কিছু করেন আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"[৯৩]

৩. অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ : অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অল্প খাবার সার্বিকভাবে মানুষের জন্য উপকারী। এ কারণেই নবী (ﷺ) খাদ্যের পরিমাণ ঠিক রাখতে একটি উপায় অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন এভাবে–

নবীজী (ﷺ) বলেছেন, 'মানুষ তার উদরের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো ভাণ্ড ভরে না। আদম সন্তানের জন্য এমন কিছু লোকমাই (খাবার) যথেষ্ট; যা তাঁর মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে। অর্থাৎ- পরিমিত খাবার গ্রহণ করা।'[৯৪]

৪. অসৎ সঙ্গ : প্রবাদ আছে, সৎসঙ্গ স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। বাস্তবেও তাই, অসৎ সঙ্গের কারণে বহু মানুষ চরম অধপতের শিকার হয়েছে। তাই মানুষের চরিত্র ও ক্বলবকে নিরাপদ রাখতে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا﴾

মানুষ বলে– 'হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।"[৯৫]

মনে রাখতে হবে– মহান আল্লাহর জিকিরে অন্তর প্রশান্তি পায়। সে কারণে ক্বলবকে প্রশান্ত ও সজিব রাখতে বেশি বেশি মহান আল্লাহর জিকির করা জরুরি। উল্লেখিত ৪ আচরণের প্রতি সতর্ক থাকাও মহান আল্লাহর জিকিরের শামিল। তাই ক্বলবে প্রশান্তি লাভে কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি। যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর জিকিরে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"[৯৬]

★ *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর;* ***মেম্বার :*** *Qur'an Research Foundation।*

[৯২] *মুসনাদে আহমাদ।*

[৯৩] *সূরা আন্ নূর : ২০।*

[৯৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[৯৫] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২৮-২৯।*

[৯৬] *সূরা আর্ রা'দ : ২৮।*

সুতরাং মু'মিন মুসলমানের উচিত, সংযত কথাবার্তা বলা। নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করা। পরিমিত খাবার গ্রহণ করা। সৎ ও নেককারদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। আর এতে মানুষের ক্বলব হবে পরিশুদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত ৪টি বদ আচরণ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক্ব দান করুন। কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে ক্বলবে হিফাযত করার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন।

৫. মন : মন দর্শনশাস্ত্রের একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা। মন বলতে, বুদ্ধি এবং বিবেকবোধের এক সমষ্টিগত রূপ যা চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মন কি এবং কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে অনেক রকম তত্ব প্রচলিত আছে। এ সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ হয়েছে মূলত প্লেটো অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকিদের সময়কাল থেকে।

মন এর সঠিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়। তবে এইভাবে বলা যেতে পারে, মন হলো এমন কিছু যা নিজের অবস্থা এবং ক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সচেতন। মনের স্বরূপ লক্ষণ হলো চেতনা যার থেকে মনকে জড়ো থেকে আলাদা করা হয়।

সাধারণত মনকে তিনটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়–

➢ মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা-এই মানসিক কাজগুলোর সমষ্টিগত রূপ বুঝায়।

➢ মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা-এই মানসিক কাজগুলো থেকে স্বতন্ত্র দেহাতিরিক্ত এক স্থান, অপরিবর্তিত আধ্যাত্ম সত্তাকে বুঝায়।

➢ মন বলতে বুঝায় এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের সম্বন্ধ যা চিন্তা, অনুভুতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়, অথচ যা নিজের স্বাতন্ত্র না হারিয়ে এই সকল মানসিক কাজের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

প্রথমটি হলো– মন-এর অভিজ্ঞতামূলক মতবাদ, পরেরটা– আধ্যাত্মিক মতবাদ, শেষেরটা– ভাববাদীদের মতবাদ। *(সান্যাল)*

৬. মন নিয়ে উক্তি : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দেখবেন না; বরং তিনি দেখবেন তোমাদের ক্বলব ও কর্মের দিকে।[৯৭]

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আপনার কাছে আমার শ্রবণের অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার ক্বলবের অনিষ্ট থেকে এবং আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে।"[৯৮]

"হে ক্বলব পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের কলবগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।"[৯৯]

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।"[১০০]

একটা সুন্দর মন অন্ধকারে আলোর মতো যার মাধ্যমে কলুষতার মাঝেও নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদাসম্পন্ন রাখা যায়। *(দানিয়েল)*

একটি মহৎ অন্তর পৃথিবীর সমস্ত মাথার চেয়ে ভালো। *(বুলার লিটন)*

দুর্বল দেহ মনকে দুর্বল করে দেয়। *(রুশো)*

মন যখন ঘুরে বেড়ায় কান আর চোখ তখন অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। *(প্রবাদ)*

মনের উপর কারো হাত নেই, মনের উপর জোর খাটানোর চেষ্টা করা। *(ম্যাকডোনাল্ড)*

সন্দেহপ্রবণ মন ভালো কাজের অন্তরায়। *(রবার্ট ব্রাউনিং)*

আমার মনে আমার ধর্মশালা। *(টমাস পেইন)*

অল্প বয়সি মনটা হিসেবে বড় হতে পারে যদি সে সময় নষ্ট না করে। *(বেকন)*

মন যদি চোখকে শাসন করে, তবে কখনো চোখ ভুল করবে না। *(পাবলিয়াস)*

মনের দিক থেকে যে দুর্বল কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল। *(জন রে)*

মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সংশয়, অবিশ্বাস আর সন্দেহ। *(সমরেশ বসু)*

যৌবনই ভোগের কাল। বার্ধক্য স্মৃতিচারণের। *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

মন হলো সবচাইতে বড় তর্কশাস্ত্রবিদ। *(ফিলিপস)*

কল্পনাশক্তিই হলো আত্মার দৃষ্টিশক্তি। *(সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী)*

আমি তোমার চোখ দ্বারা দেখি, কিন্তু বুঝি মন দ্বারা। *(জন স্টিল)*

---

[৯৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৪।*

[৯৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৯২।*

[৯৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৫৪।*

[১০০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪০, ৩৫২২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৩৪।*

মন দিয়ে মন বুঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে। *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

যে মন কর্তব্যরত নয় সে মন অনুপভোগ্য। *(বেভো)*

সন্দেহপ্রবণ মন এক বৃহৎ বোঝাস্বরূপ। *(ফ্রান্সিস ফুয়ারেলস)*

দুনিয়াতে মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই আর মানুষের মাঝে মনের চেয়ে বড় নেই। *(স্যার উইলিয়াম হ্যামিলন)*

যে মনের দিক থেকে বৃদ্ধ নয়, বার্ধক্য তার জীবনে আসে না। *(ফিলিপ মেসেঞ্জার)*

মনের অনেক দরজা আছে সেখানে অসংখ্য জন প্রবেশ করে এবং বের হয়ে যায়, তাই সবাইকে মনে রাখা সম্ভব হয় না। *(টমাস কেম্পিস)*

আত্মা কলুষিত হতে শুরু করলেই মন আকারে ছোট হতে থাকে। *(রুশো)*

একটা মন আর একটা মনকে খুঁজিতেছে নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য। *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

শিশুদের মনটা স্বর্গীয় ফুলের মতোই সুন্দর। *(এডমন্ড ওয়ালীর)*

যে মন সুখী এবং পরিতৃপ্ত সেই মনই মহৎ। *(ফার্গুসন)*

কারো মন বুঝতে যাবেন না, কারণ এতে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মন বুঝা শেষ হবে না। *(হাবিবুর রাহমান সোহেল)*

প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই একটা শিল্পীমন ঘুমিয়ে আছে। *(বেকন)*

দুনিয়ার সবচেয়ে হেঁয়ালী হচ্ছে মেয়েদের মন। *(কাজী নজরুল ইসলাম)*

মন্দ কাজ হতে বাঁচার জন্য পরিচ্ছন্ন মনের প্রয়োজন। মন পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহও পরিচ্ছন্ন থাকে। *(ইমাম গাজ্জালি)*

খাঁটি সরল এবং সুস্থ হচ্ছে সেই মন যা ছোট বড় সকল বস্তুকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে। *(স্যামুয়েল জনসন)*

একটা সুন্দর মন অন্ধকারে আলোর মতো যার মাধ্যমে কলুষতার মাঝেও নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদাসম্পন্ন রাখা যায়। *(দানিয়েল)*

মনের দিকে আমাদের দেখা উচিত, বাইরের বেশভূষার দিকে নয়। *(ঈশপ)*

মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তার সংশয় অবিশ্বাস আর সন্দেহ। *(সমরেশ বসু)*

তুমি যদি মনের সজীবতা ধরে রাখতে চাও, তাহলে সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখ। *(টমাস হুড)*

ধনে এবং জ্ঞানে বড় হলেই মানুষ মনের দিক থেকে বড় হয় না। *(স্মিথ)*

দুনিয়াতে মানুষের মনই বোধহয় সবচেয়ে দুর্গম ও দুর্জেয়। *(মুহম্মদ আব্দুল হাই)*

মনের দিক থেকে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল। *(জন রে)*

মনের নির্দেশ মানতে হলে দেহকেও শক্তিশালী করে তুলতে হয়। *(রুশো)*

মনের উপর কারো হাত নেই। মনের উপর জোর খাটানোর চেষ্টা বৃথা। *(ম্যাকডোনাল্ড)*

মানুষের মন যত প্রসারিত হবে ততই মানুষ নীচতা ও গ্লানির মধ্যে সুন্দরের সন্ধান পাবে। *(টেনিসন)*

দোষ, গুণ, ভুল ভ্রান্তি মিলেই মানুষের জীবন। অন্যকে ক্ষমা করার মতো মহৎ। মন প্রত্যেকের থাকা চাই। *(রবার্ট ক্যাম্পারস)*

মানুষের মনটা মাটির মতো কিন্তু তা থেকেই ক্রমশ অদ্ভুত এবং সুন্দরতম জিনিস আসে। *(ডাব্লিউ জে টারনার)*

মন যখন অন্যত্র, চোখ তখন অন্ধ। *(পাবলিয়াস সাইরাস)*

যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। *(প্রমথ চৌধুরী)*

মানুষের মন আকাশের চেয়ে বড়, সমুদ্রের চেয়ে গভীর হতে পারে। *(টমাস চাম্পিয়ান)*

কুৎসিত মন একটি সুন্দর মুখের সমস্ত সৌন্দর্য কেড়ে নেয়। *(স্পেন্সার)*

সুস্থ মন মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচার সহায়তা করে। *(ফার্গুসান)*

আমি তোমাকে চোখ দিয়ে দেখি কিন্তু বুঝি মন দিয়ে। *(জনস্টিল)*

দুর্বল দেহ মনকে দুর্বল করে দেয়। *(রুশো)*

জ্ঞানীর অন্তর, দর্পণের মতো কোনোভাবে অমলিনতা হারিয়েই সকল বস্তুকে প্রতিবিম্বিত করবে। *(কনফুসিয়াস)*

মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন। আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরে। *[সমাপ্ত]*

হিজাব-পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেপথ্য

–মীযান মুহাম্মদ হাসান*

দেশে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক দাঙ্গা বাধাতে কম কসুর করছে না ইসলাম বিদ্বেষীরা। কখনো ধর্মান্তরিত করে। কখনো কারও ধর্ম পরিবর্তনের অজুহাতে তৈরি করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা।

এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কখনো বা চালানো হচ্ছে দাড়ি টুপির বিরুদ্ধে। কখনও বা পানজাবি কিংবা জুব্বার বিরুদ্ধে।

সেই ধারাবাহিকতায়, কখনও বা মুসলিম নারীদের 'হিজাব বোরকা পর্দা'র বিরুদ্ধেও রটেছে গুজব। হয়েছে সমালোচনা। চলেছে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন ও মানববন্ধন। কখনো ঢাবি'র ক্যাম্পাসে নামায আদায়ের জন্য লড়তে হয়েছে আমাদের দ্বীনি বোনদের। এখনো তারা ক্যাম্পাসে নামায রোযা ও 'ইবাদতের সুষ্ঠু পরিবেশ পায় না বলে অভিযোগ আছে। এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে আবার এই নারীরাই।

পশ্চিমা কালচারের দেশে হিজাব বোরকা পর্দা আবৃত নারী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারলেও, আমাদের দেশে ধর্মীয় বিধান পালনেই যত বাধা।

গেল ডিসেম্বরে হিজাব ইস্যুতে পুলিশ হিফাযতে মৃত্যুবরণ করে ইরানি এক তরুণী মাহসা আমিনি। এতে সারা বিশ্বে গণমাধ্যমগুলো অপপ্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

কিন্তু বিবিসির এক সাক্ষাতকারে উঠে আসা প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক নারী শিক্ষার্থীর একটি বক্তব্যও ছিল উল্লেখ করার মতো। সেখানে ফাতিমাহ্ মোসাভিয়ান নামের এক শিক্ষার্থী দাবি করেছেন, যারা প্রতিবাদ করছে, তারা বিদেশে থাকে, বিচ্ছিন্নতাবাদী, দাঙ্গাবাজ। তারা গুণ্ডা। তারা মানুষের ভালো মন্দ চিন্তা করে না। যারা যেকোনো একটি ইস্যুকে ব্যবহার করে দাঙ্গা তৈরি করে।

"ইরানে হিজাব ইস্যুতে পুলিশী হিফাযতে মাহসা আমিনি নামে এক তরুণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চলা বিক্ষোভের ১০০ দিন হলো। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানে দীর্ঘতম চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ এটি। তবে চলমান বিক্ষোভ শাসকদের নাড়া দিলেও বহু মানুষকে খেসারত দিতে হচ্ছে।"

এমনকি তারা এও দাবি করেছে বিবিসির বরাতে, সেখানে নিহতের সংখ্যা ছিল পাঁচ শতাধিকের বেশি।[১০১]

এখন প্রশ্ন হলো– এই যে হিজাব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। এর নেপথ্যে তবে কি রহস্য লুকিয়ে আছে? ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যই কি এই আয়োজন ছিল? ইরান একটি বিতর্কিত মুসলিম দেশ হলেও, তারা ধর্মীয় বিধান পালনে যতটুকু সচেতন, ঠিক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার অর্থ কী? ঠিক একইভাবে আমাদের দেশে পর্দা হিজাব বোরকার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। তবে তারা কী জানেন, এগুলো হলো এক একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়। নৃবিজ্ঞান যে বিষয়ে জোরালো সমর্থন করে। তবে বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্য কি তা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

তারা কিন্তু পশ্চিমা কালচারের শর্ট পোশাকে অভ্যস্ত। এমনকি এসবে তাদের বাঙালি সংস্কৃতি নষ্ট হয় না। জাত যায় না। কেবল ইসলামের দাড়ি টুপি জুব্বা ও হিজাব বোরকা পর্দায় তাদের শত আপত্তি। আমরা যদি এখনও আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে সচেতন না হই! তবে আমাদের মেয়েরা, নারীরা এদেশেই তাদের ধর্মীয় বিধান পালনের স্বাধীনতা হারাবে দিন দিন।

তাই আসুন, এখনো সময় আছে, আমরা সচেতন হই। নিজের পরিচয় ও সংস্কৃতি বিকাশ করতে সোচ্চার হই। ❑

---

* *লেখক : শিক্ষক, আলেম ও সাংবাদিক।*

[১০১] *২৬/১২/২২ জাগো নিউজ।*

কবিতা

সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়ব

মোল্লা মাজেদ[★]

সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়বে যুগ যন্ত্রণার কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ আমার পৃথিবী, প্রতিনিয়ত বাজখাঁই গর্জনে পরিপূর্ণ এ দীর্ঘশ্বাস অপাঙ্গে প্রবাহিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস।

সুনীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের উড়ন্ত পাখার আলতো স্পর্শ বিলুপ্ত, চলন্ত জেট প্লেনের কঠিন ডানার সংঘর্ষে শান্ত আকাশ আজ বিদীর্ণ। স্বচ্ছতা হারিয়ে নীল শূন্য নীল দরিয়াও টর্পেডো সাবমেরিনের বর্জ্য পদার্থের বিষাক্ত আস্তরণে আচ্ছাদিত।

সুবাসিত সমীরণ বিদ্রোহে সারাক্ষণ

তীব্র বারুদের গন্ধ ছড়াতে স্বেচ্ছায় নিমগন।

সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়বে লুণ্ঠিত পৃথিবী নিঝুমে ঘুমোয় সবখানে বেইনসাফ, বেরহমে পরিপূর্ণ মুনাফেকি আবর্তের কলঙ্কিত কালিমায় প্রলেপ দোলায়,

সঠিক সততা যেন উদ্ধত ভুজঙ্গের তিক্ত ফণায়।

প্রহেলিকা

এম. এ মুমিন

আমাদের এই সমাজটাকে
নষ্ট করল যারা;
তাদের তুমি জ্ঞানী বলছ,
জাহেল তবে কারা?
শিশু-নারীর অধিকারে
লড়াই করে যারা,
সমকামীর স্বপ্ন দেখায়
জ্ঞানী বুঝি তারা?
স্বপ্ন যাদের আদি যুগের
নগ্ন হওয়ার কৃষ্টি!
নারী-পুরুষ যা-ই বলো
লোলুপ যাদের দৃষ্টি।
তারাই নাকি বুদ্ধিজীবী,
বুদ্ধি বেঁচে খায়,
তারা শুধু শয়তান নয়,
শয়তান তাদের পায়!

জাহেলিয়াত যায়নি দেখো–
আসছে আবার ফিরে।
বসছে আবার জুয়ার আসর
মদ-নারীদের ঘিরে।
মাতাল নারীর কাণ্ড দেখো
শহর-নগর জুড়ে
পেটের দায়ে আজকে তারা
হণ্যে হয়ে ঘুরে।
শরীরে তাদের নেইকো পোশাক
রূপ দেখানোর আয়না।
কি-যে তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি!
ঘরে থাকা যায় না।
বিয়েতে দেখো হাজার প্রশ্ন
প্রেমে নেই কো বাধা।
তারাই যদি জ্ঞানী হয়
কাকে বলবো গাধা?
ব্যবসায়ীরা সুদের ঘোরে
কিস্তি গ্রামে গ্রামে,
ঘুষ ছাড়া মিলে না চাকরি
উপর মহল জানে।
সিন্ডিকেটের কারসাজিতে
কেনা-বেচা দায়।
টহলরত ট্রাফিক-পুলিশ
কে না চাঁদা চায়?
দুর্নীতি সস্তা অতি-
সব জায়গাতে আছে।
কার কাছে চাইবো বিচার
অপরাধীর কাছে?
জুলুম-ইনসাফ এক কাতারে
বিচার কোথাও নাই।
বিচার চাইলেই শাস্তি তোমার
জেল-হাজতে ঠাঁই।
হক্ব কথা বললেই তোমার
কণ্ঠ নিবে ছিঁড়ে।
ন্যায়-নীতি আজ হারিয়ে গেছে
অপরাধীর ভীড়ে।

[★] *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য স্যোসাল মিডিয়ায় ফটো সেশন করা যাবে কি?*** *আহমেদ*
গৌরিপুর, কুমিল্লা।

জবাব : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি–

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

"দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোনো ছবি অংকন করবে কিয়ামতের দিন তাকে সেটাতে রূহ্ প্রদান করার আদেশ দেয়া হবে। সে তাতে রূহ্ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৬৩)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি–

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

"কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৫০)*

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ (ﷺ) وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

"একদা রাসূল (ﷺ) আমার কাছে আগমন করলেন। সে সময় বাড়িতে একটি চাদর ছিল। তাতে ছিল বিভিন্ন রকম ছবি। কাপড়টি দেখে ক্রোধে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেটিকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন : যারা এ সমস্ত ছবি আঁকবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬১০৯)*

অতএব বিনা কারণে মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবি উঠানো বৈধ নয়। প্রয়োজনবশত যেমন- পরিচিতি, পাসপোর্ট, আইডি কার্ড, পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছবি ব্যবহার করা বৈধ। ফটো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি চলছে, তা পরিহার করা উচিত। ইসলামের প্রচার প্রসারের নামে স্যোসাল মিডিয়ায় ফটো সেশন করা যাবে না।

যদিও অনেক আলেম ওলামা দাওয়াতের অংশ হিসেবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্সের ছবি পোস্ট করাকে জায়িয মনে করেন। তবে অকারণে বিশেষ করে স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তা একেবারে না জায়িয হবে নিঃসন্দেহে।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***সুন্নাত ও নফল সালাতে তাকবীরে তাহরিমার পর সানা পাঠ আবশ্যক, না কি ঐচ্ছিক?***
আব্দুল মুমিন
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : অধিকাংশ আলেমের মতে সালাতের তাকবীর তাহরীমার পর সানা পাঠ করা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে ফর্য ও সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ফর্য সালাতে যেমন- সানা পাঠ করা সুন্নাত তেমনি নফল ও সুন্নাত সালাতেও সানা পাঠা করা সুন্নাত। অনুরূপ চাশতের সালাত, তারাবীর সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, বিতর সালাত ইত্যাদি সুন্নাত-নফল সালাতে সানা পাঠ করা সুন্নাত। কেননা নবী (ﷺ) সালাতের শুরুতে তাকবীর তাহরীমার পর সানা পাঠ করতেন। কিন্তু ফর্য ও সুন্নাতের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না। *(দেখুন : সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৭)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***জনৈক ওয়ায়েজিন বলেছেন, ফজর ও 'আসরের নামায হানাফী মসজিদে আদায় করা যাবে না। কেননা তারা ওয়াক্তের অনেক পরে সালাত আদায় করে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান পেতে ইচ্ছুক।*** *আমীর হামজা*
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

জবাব : যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তারা 'আসর ও ফজরের সালাত খুবই বিলম্ব করে আদায় করে থাকে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী। এখন প্রশ্ন হলো– যেসব ইমাম 'আসর ও ফজরের সালাত দেরি করে আদায় করেন, আমরা কি তাদের পিছনে সালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষা করবো, না কি সময় হলেই আমরা নিজ নিজ বাড়িতে একাকী সালাত আদায় করে নিবো? এ ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি হলো, ইমামগণ দেরিতে সালাত আদায় করলে আমরাও দেরি করে তাদের সাথেই সালাত আদায় করবো। তাদের আগেই

আমরা সালাত আদায় করবো না। এটাই সালাফদের মানহাজ। এ ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সালাফদের পথে চলার মধ্যেই কল্যাণ। তবে তারা যদি এমন বিলম্ব করে, যাতে সালাতের সময় একেবারেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা তাদের অপেক্ষা না করে সঠিক সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করে নিবো। তাদের অপেক্ষা করবো না।

যদি তারা বিলম্বের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে তবে নিজে একাকী সলাত আদায় করে নিবে অতঃপর পুনরায় তাদের সাথে জামা'আতে শরীক হবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ইমাম সাহেব যদি অসুস্থতার কারণে রুকূ'-সিজদা করতে অক্ষম হয়, তাহলে কি তার পিছনে ইক্তেদা করা যাবে? *আবুল কালাম আজাদ, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

জবাব : ইমাম নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, এমন ইমাম নিযুক্ত করা, যিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সালাতের সমস্ত রুকন পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে সক্ষম। এখন প্রশ্ন হলো– রুকূ'-সিজদা ঠিকমত আদায় করতে পারেন না –এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা সঠিক কি না? এ ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের মত হচ্ছে– অক্ষম ইমামের পিছনে কেবল অক্ষম লোকদের ইক্তেদা করা বৈধ। অতঃএব যেই ইমাম অক্ষমতার কারণে সিজদায় যেতে পারে না, তার পিছনে সিজদায় যেতে সক্ষম লোকদের সালাত আদায় করা বৈধ নয়। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে অক্ষম লোকের সালাত যেহেতু বিশুদ্ধ, তাই তার পিছনে সালাত আদায় করাও বিশুদ্ধ। সিজদায় যেহেত অক্ষম ইমামের পিছনে সক্ষম মুক্তাদীরা সঠিকভাবেই সিজদা করবে; তারাও ইমামের মতো ইঙ্গিতের মাধ্যমে সিজদা করবে না। আর রুকূ'-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করতে অক্ষম ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা বিশুদ্ধ হওয়ার দলিল হচ্ছে– নবী (ﷺ) বলেন.

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"মুসল্লীদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিই ইমামতির জন্য যোগ্যতম বিবেচিত হবে, যে মহান আল্লাহর কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক পারদর্শী।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৭৩)*

এই হাদীসে নবী (ﷺ) মহান আল্লাহর কিতাব পাঠের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করার কথা বলেছেন। রুকূ'-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করতে পারা বা না পারাকে ইমামতির মাপকাঠি নির্ধারণ করেননি। উল্লেখ্য যে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এ মতকেই পছন্দ করেছেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

জিজ্ঞাসা (০৫) : 'আসরের সালাতে তৃতীয় রাকআতে শরীক হওয়ার দরুন ইমাম সাহেব যখন শেষ বৈঠকে তখন আমার এক রাকআত শেষ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইমামের শেষ বৈঠকে আমি কি চুপ থাকব, না কি শেষ বৈঠকের দু'আগুলো পাঠ করব? অবশ্য একজন আলেম বলেছেন, শুধু তাশাহ্হুদ পাঠ করা যাবে। বিষয়টি জানিয়ে ধন্য করবেন। *আনিসুর রহমান, মোকামতলা, বগুড়া।*

জবাব : আপনি যদি ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে যোগদান করেন অথবা আপনার এক রাকআত পড়া হলেই যদি ইমাম শেষ বৈঠকে চলে যান, তাহলে আপনি ইমামের সাথে তাশাহ্হুদে বসবেন। এমতাবস্থায় আপনি ইচ্ছা করলে শুধু 'আত্ তাহিয়্যাতু' পড়ে চুপ থাকতে পারেন অথবা ইমামের অনুসরণ করে সবগুলো দু'আ পাঠ অব্যাহত রাখতে পারেন। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটাই উত্তম। কারণ, এতে ইমামের অনুসরণ করা হয়। আর সালাতের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *(লাজনা দায়েমা- ফা. নং- ৬/২২৪-২২৫)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : নবীগণ কবরে জীবিত এবং সালাত আদায় করেন, সে অর্থে হায়াতুন নবী বলা যাবে কি?

মুহা. রানা মিয়া
বাজুনিয়া, গোপালগঞ্জ।

জবাব : নবীগণ কবরে জীবিত এবং সালাত আদায় করেন –এই হাদীস সহীহ। তবে তাদের কবরের জীবন দুনিয়ার জীবনের মতো নয়। সেটা বিশেষ এক ধরনের হায়াত, যার ধরণ-পদ্ধতি আমরা জানি না। কবরে তাদের জীবন ও কবরে তাদের সালাত দুনিয়ার জীবনের সালাতের চেয়ে ভিন্ন। আর এই হাদীস দ্বারা হায়াতুন নবী সাব্যস্ত করা অর্থাৎ- এই কথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, নবী (ﷺ) দুনিয়ার জীবনের মতোই জীবিত আছেন; বরং এটা চরম মূর্খতার পরিচয়।

জিজ্ঞাসা (০৭) : কতিপয় সহীহ 'আক্বীদার ওয়ায়েজিন বলেছেন, সালাতে বুকের উপর হাত বাধার হাদীস সহীহ নয়। এ বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? মুহা. মামুনুর রশীদ
সৈয়দপুর, বগুড়া।

জবাব : নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

"লোকেরা নির্দেশিত হতো, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করে।" *(বুখারী- হা. ৭৪০)*

কিন্তু প্রশ্ন হলো– হাত দু'টিকে কোন্ স্থানে রাখবে? বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে– হাত দু'টি বুকের উপর রাখবে। ওয়ায়েল ইবনু হুজ্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

"নবী (ﷺ) ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করতেন।" *(ইবনু খুযাইমাহ্- অধ্যায়ে : সালাত, ৪৭৯)*

এছাড়া ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখার ব্যাপারে সহীহুল বুখারীতে উল্লেখিত হাদীসটিতে বুকের উপর হাত রাখা সুন্নাত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু খুযাইমাহ্ বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। *[দেখুন : রাসূল (ﷺ)-এর নামাযের পদ্ধতি]*

তিনি আরো বলেন, এর বিপরীত হাদীসগুলো হয় দুর্বল, না হয় ভিত্তিহীন। হাদীসটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এক্ষেত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। আর বুকের বাম দিকে অন্তরের উপর হাত বাঁধা একটি বিদআত। এর কোনো ভিত্তি নেই।

নাভীর নীচে হাত বাঁধার ব্যাপারে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা দুর্বল– *(আহমাদ- ১/১১০; আবূ দাউদ- অধ্যায় : কিতাবুস সালাত)*। ইমাম নববী বলেন, এর সনদে 'আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক আল ওয়াসেতী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। মুহাদ্দেসীনদের মতে তিনি দুর্বল। সুতরাং এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়ায়েল ইবনু হুজুরের হাদীসটি এরচেয়ে অধিক শক্তিশালী।

নামাযে হাত বাধার স্থানের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মূলনীতি হলো নামায কিংবা ইসলামী শরিয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-পদ্ধতিতে নারী-পুরুষ সবাই সমান। দলিল ছাড়া উভয়ের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা বৈধ নয়। এই সুন্নাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার সহীহ কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই।

জিজ্ঞাসা (০৮) : জেলা শহরে আমার একটি বাড়ি আছে। বাসা ভাড়া দিয়েই আমার সংসার চলে। আমি কি কোনো হিন্দু ধর্মের অনুসারীকে ঘর ভাড়া দিতে পারব? কেননা সে আমার বাড়িতে পূজা অর্চনা করবে এটাই স্বাভাবিক। এখন আমার করণীয় কী? *মুহাম্মদ সিরাজ শেখ*
বাজনিয়া, গোপালগঞ্জ।

জবাব : শুধু বসবাসের জন্য অমুসলিমদেরকে বাড়ি-ঘর ভাড়া দেয়া বৈধ। তবে যদি জানা যায় যে, পাপাচার, মদের ব্যবসা ও অশ্লীল কাজের জন্য ঘর ভাড়া নিচ্ছে অথবা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য ভাড়া নিচ্ছে, তাহলে তাদেরকে ভাড়া দেয়া যাবে না। কারণ, এতে পাপকাজে সহযোগিতা করা হবে। কিন্তু বসবাসের জন্য ভাড়া নিয়ে যদি বাড়ি ওয়ালার অজান্তে তারা সেখানে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে অথবা কোনো পাপকাজ করে, তাহলে বাড়ি ওয়ালার কোনো গুনাহ হবে না।

ইমাম সারাখসী বলেন, বসবাসের জন্য মুসলিম অমুসলিমকে তার ঘর ভাড়া দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এজন্য ভাড়া নিয়ে সে যদি তাতে মদ পান করে অথবা তাতে অমুসলিমের ধর্ম চর্চা করে কিংবা তাতে শূকর আনয়ন করে, তাহলে মুসলিমের কোনো গুনাহ হবে না। কেননা সে তো এগুলো করার জন্য ভাড়া দেয়নি। ভাড়াটিয়ার গুনাহ হবে; বাড়িওয়ালার নয়। *(আল-মাবসূত- ১৬/৩৯)*

তবে এ কথা সঠিক যে, অমুসলিমকে ভাড়া না দিয়ে মুসলিমকেই ভাড়া দেয়া উত্তম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : 'আক্বিক্বাহ্ হওয়ার এক/দুই বছর পর নাম পরিবর্তন করে নতুন করে রাখা যাবে কি? *আব্দুল মালেক*
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : প্রয়োজনবশত 'আক্বীক্বাহ্ হওয়ার পর নাম পরিবর্তন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে নামের মধ্যে যদি অপছন্দনীয় অর্থ বিদ্যমান থাকে, তখন তা পরিবর্তন করে ভালো অর্থ বিশিষ্ট নাম রাখা উচিত। নবী করীম (ﷺ) তাঁর একাধিক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন। তবে 'আক্বীক্বাহ্ হওয়ার পর নাম পরিবর্তন করা হলে দ্বিতীয়বার 'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার প্রয়োজন নেই। *(দেখুন : শাইখ আল-উসাইমীন- প্রশ্নোত্তর নং- ৪০৩২১)*

জিজ্ঞাসা (১০) : দয়া করে মুহার্‌রাম মাসের ফযীলত সম্পর্কে জানাবেন। *জয়নাল আবেদীন, গাবতলী, বগুড়া।*

জবাব : হিজরী সালের প্রথম মাস হচ্ছে মুহার্‌রাম। আসমানী রিসালাতে এ মাসের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। এটা একটা বিশেষ বরকতময় মাস। এটা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হলো বারো মাস। এর মধ্যে চারটি মাস হলো হারাম (পবিত্র)। এটাই সরল দ্বীন। অতএব তোমরা এমাসগুলোর মধ্যে নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।" *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬)*

আবূ বাক্‌রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (ﷺ) বলেন, বছরের মধ্যে রয়েছে বারোটি মাস। তার মধ্য থেকে চারটি হচ্ছে হারাম (পবিত্র)। তিনটি আসে পরপর। এগুলো হচ্ছে যুলক্বাদ, যুলহাজ্জ ও মুহার্‌রাম এবং জুমাদা ও শা'বানের মধ্যে রয়েছে রজব। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৫৮)*

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ- তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের উপর যুলুম করো না। অতঃপর এমাসগুলো থেকে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এবং এগুলো পবিত্র করেছেন ও তাতে পাপ কাজ করাকে কঠোরভাবে হারাম করেছেন। সেই সঙ্গে এগুলোতে সৎ 'আমলের সওয়াব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম ক্বাতাদাহ্ বলেন, হারাম মাসগুলোতে যুলুম ও পাপাচারের অপরাধ অন্যান্য মাসগুলোর তুলনায় বেশি। যদিও যুলুমের পরিণাম সবসময়ই ভয়াবহ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বড় ও যাকে ইচ্ছা ছোট করেন। ক্বাতাদাহ্ আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে বেশ কিছু সৃষ্টিকে সম্মান দিয়েছেন ফেরেশ্তাদের থেকে বাছাই করেছেন বেশকিছু দূত। মানুষ থেকেও সম্মানিত করেছেন অনেক রাসূলকে। কথা-বার্তার মধ্য থেকে বাছাই করেছেন তার যিকিরকে। যমীন থেকে সম্মানিত করেছেন মক্কা, মদীনা, বাইতুল মুকাদ্দাস ও পৃথিবীর সমস্ত মসজিদকে। আর মাসগুলো থেকে বাছাই করেছেন রামাযান ও হারাম মাসগুলোকে। দিনগুলো থেকে সম্মানিত করেছেন জুমু'আর দিনকে। রাতগুলো থেকে মর্যাদাবান করেছেন লাইলাতুল কদরকে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্মান করেছেন, তোমরাও তাকে সম্মান দাও।

জিজ্ঞাসা (১১) : *আশুরার সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।* *আব্দুর রহমান (তোহা), বড়িয়াহাট, বগুড়া।*

জবাব : আশুরার সিয়ামের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও তাঁর সাথীদেরকে ফিরআউনের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার বাহিনীকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিন সিয়াম রেখেছেন এবং বানী ইসরাঈলকে সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন। বুখারী'র বর্ণনায় এসেছে–

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে দেখতে পেলেন যে, তারা আশুরার সিয়াম রাখছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ দিন কিসের সিয়াম রাখছো? তারা বললো, এটা বিরাট দিন। আল্লাহ এতে মূসাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআউনকে ধ্বংস করেছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, আমরাই তোমাদের চেয়ে মূসার অনুসরণ করার চেয়ে বেশি হক্বদার। অতএব তিনি সিয়াম রাখলেন এবং সিয়াম রাখার আদেশ দিলেন। *(সহীহুল বুখারী- ১১৩০)*

আর খাসভাবে আশুরার সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, এটা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়। *(দেখুন : সহীহুত্ তারগীব- হা. ১০১৩)*

জিজ্ঞাসা (১২) : *বলা হয়ে থাকে যে, সাহাবীগণ ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং তার আনুগত্য বর্জন করেছিলেন। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।*

কামাল মিয়া
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

জবাব : বিজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর, হুসাইন ইবনু 'আলী এবং 'আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইয়াযীদ ইবনু মু'আবীয়ার আনুগত্য বর্জন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়– *(তারীখ তাবারী- ৫/৪০০; আল-কামিল ফিত্ তারীখ- ৩/১৫৭; তারিখুল ইসলাম আয্ যাহাবী- ৫/৫; আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- ৮/১৮৯)*। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধে যালেম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ও বিদ্রোহ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফ্রী পাওয়া যায় এবং তাকে ক্ষমতা থেকে নামানোর শক্তি থাকে। কুফ্রী পাওয়া গেলে এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তাকে নামানোর মত শক্তি অর্জিত হলে তার আনুগত্য বর্জন করা জায়িয আছে। *[ইমাম আল-বানী (রহিমাহুল্লাহ)'র তাখরীজসহ শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্-তাহাবীয়া- পৃ. ৩০৩-৩০৪]*

জিজ্ঞাসা (১৩) : *কোনো কোনো আলেম ইয়াযীদের সমালোচনা করে থাকেন এবং তাকে গালিগালাজ করে থাকেন। এ ব্যাপারে আহলুল হাদীসদের মতামত জানতে চাই।*

মো. কামাল
গোয়ালপাড়া, পঞ্চগড়।

জবাব : শী'আহ্ ঐতিহাসিক ও লেখকগণ ইয়াযীদের সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করেছে। এসব বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু সুন্নী মুসলিমও ইয়াযীদের সমালোচনা করে এবং গালিগালাজও করে, যা মোটেই ঠিক নয়।

আহলুল হাদীস বা আহলুস সুন্নাত-এর কোনো আলেম তার নামের শেষে "রহিমাহুল্লা-হ" বা "লা'আনাহুল্লাহ" –এ দু'টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেননি। সুতরাং তিনি যেহেতু তার 'আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার 'আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের 'আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভালো মন্দ 'আমলের হিসাব তিনিই দিবেন।

ইমাম যাহাবী ইয়াজিদের ব্যাপারে বলেন : لانسبه ولانحبه অর্থাৎ- আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালোওবাসবো না। মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরও যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াজিদের প্রতি দেয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

সুতরাং তিনি মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ।

জিজ্ঞাসা (১৪) : *মুসাফাহ করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।*

আব্দুল আউয়াল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : দুইজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাত করার সময় মুসাফাহ করা এবং সালাম দেয়া ইসলামী শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এতে দুইজন মুসলিমের পারস্পরিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অনুরূপভাবে এতে মুসলিমদের মধ্যে থেকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণাবোধ বিদূরিত হয়। কিন্তু মুসলিমদের মধ্য থেকে বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতটি প্রায় উঠেই গেছে। অথচ মুসাফাহ'র ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

"যখনই দুইজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে অতঃপর তারা মুসাফাহা করে, তখন তাদের দুইজনের হাত আলাদা হওয়ার আগেই তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়ন– *[সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫২১২, ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]*। তাই সাহাবীদের মাঝে মুসাফাহা করার সুন্নাতটি বিদ্যমান ছিল। তারা পরস্পর দেখা হলেই মুসাফাহা করতেন। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে– *(দেখুন : ফতহুল বারী- ১১তম খণ্ড, পৃ. ৫৫)*।

মুসাফাহা করার সুন্নাতী নিয়ম হচ্ছে– একজন তার ডান হাতের তালু অন্যজনের ডান হাতের তালুতে রাখবে। এটাই হচ্ছে আরবী ভাষায় মুসাফাহার অর্থ। অর্থাৎ- দুইজনের দুইহাত দিয়ে মুসাফাহা করবে, চার হাত দিয়ে নয়। অধিকাংশ আলেম মুসাফাহার ক্ষেত্রে এটাকেই সুন্নাত বলেছেন। সহীহ হাদীসে হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে– নবী (ﷺ) বলেছেন,

إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر.

"একজন মুসলিম যখন আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার একহাত দিয়ে তার সাথে মুসাফাহ করে তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ার মতোই তাদের দুইজনের গুনাহসমূহ ঝরে যায়।" *(দেখুন : সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১/৫২)*

এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, দুইজনের প্রত্যেকেই একহাত দিয়ে মুসাফাহা করবে। এটাই সুন্নাত। কিন্তু হানাফী মাযহাবের কতিপয় ফকীহ বলেছেন, প্রত্যেকেই তার দুই হাত দিয়ে অর্থাৎ- চার হাতে মুসাফাহা করা মুস্তাহাব। অথচ এটা রাসূল (ﷺ) সুন্নাত কিংবা সাহাবীদের 'আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব আমাদের উচিত সকল ক্ষেত্রে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করা। এতেই রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ। সেই সঙ্গে সুন্নাত বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা। কারণ সুন্নাত বিরোধী 'আমলের মধ্যেই রয়েছে অকল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাত মোতাবেক 'আমল করার তাওফীক দিন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৫) : আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নাস্র-এর মধ্যে তাঁর নবীকে ইস্তিগফার পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। দয়া করে এর উপকারিতা সম্পর্কে জানাবেন।

আব্দুল আউয়াল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : ইস্তিগফার পাঠের মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। তাফসীর কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা এক লোক হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ)'র কাছে এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি তাকে ইস্তেগফার করার আদেশ দিলেন। আরেক লোক তার কাছে এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করলো। তিনি তাকেও ইস্তেগফার করার আদেশ দিলেন। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে তার বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ করলো। তিনি তাকেও ইস্তেগফার করার উপদেশ দিলেন। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমার সন্তান হয় না। তাকেও তিনি ইস্তেগফারের আদেশ দিলেন। হাসান বসরীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো এবং বলা হলো– আপনি সবাইকে একই উপদেশ দিচ্ছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, এগুলো আমি নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে বলিনি; বরং উল্লেখিত সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। অতঃপর তিনি সূরা আন্ নূহ'র এই আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ○ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ○ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

"আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদেরকে দিবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা।" *(সূরা আন্ নূহ : ১০-১২)*

জিজ্ঞাসা (১৬) : আমি মাঝে মাঝে নফল সিয়ামের ইচ্ছা করি। কিন্তু রাতে ঘুম থেকে উঠে সেহরী খেতে না পারার

কারণে নফল সিয়াম রাখতে পারি না। এ বিষয়ে আমাকে কিছু পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন। *আহসানুল্লাহ বনশ্রী, ঢাকা।*

জবাব : শুধু ফর্‌য সিয়ামের ক্ষেত্রেই কেবল রাতে নিয়ত করা আবশ্যক। নফল সিয়ামের নিয়ত বেলা উঠার পরেও করা যায়। সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ذَاتَ يَوْمٍ : يا عَائِشَةُ، هلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قالَتْ : فَقُلتُ: يا رَسُوْلَ اللهِ، ما عِنْدَنَا شيءٌ، قالَ : فإِنِّي صَائِمٌ.

"একদিন আমাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে 'আয়িশাহ্! তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? 'আয়িশাহ্ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঘরে কিছুই নেই। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, তাহলে আমি সিয়াম রেখে দিলাম।" *(দেখুন : সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৪)*

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সকাল হওয়ার পরও নফল সিয়ামের নিয়ত করা যায়। আরেকটি কথা স্মরণ রাখবেন। তা হলো– যে কোনো সিয়ামের জন্য সেহরী খাওয়া সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। আমাদের সমাজের মুসলিম ভাই-বোনদের মধ্যে এ বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েছে। তারা মনে করে সিয়ামের জন্য রাতে সেহরী খাওয়াটা জরুরী। এই জন্যই আপনি রামাযান মাসেও কোনো কোনো মুসলিমকে বলতে শুনবেন, আজ রাতে আমি সজাগ পাইনি, সেহরী খেতে পারিনি...। তাই সিয়াম রাখতে পারিনি। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। আল্লাহ সহায়।

জিজ্ঞাসা (১৭) : দুই সালাত একত্রিত করে আদায় করার হুকুম সম্পর্কে জানতে চাই। *ওয়াজেদ আলী কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

জবাব : নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযের সময়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তখন কোনো নামায নির্ধারিত সময়ের বাইরে আদায় করা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করার শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা অতিক্রম করবে, তারাই অত্যাচারী।" *(সূরা আল বাক্বারাহ : ২২৯)*

অতএব যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং তাকে পুনরায় সেই নামায পড়তে হবে। কিন্তু যদি অজ্ঞতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে, সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই পরবর্তী নামাযকে পূর্ববর্তী নামাযের সাথে জমা করার ক্ষেত্রেও একই কথা। বিনা কারণে পরবর্তী নামাযকে পূর্ববর্তী নামাযের সাথে জমা করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। পুনরায় তাকে সেই নামায আদায় করতে হবে।

আর বিনা ওযরে জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে নামায আদায় করবে, সে গুনাহগার হবে এবং প্রাধান্যযোগ্য মতে তার নামায কবূল হবে না। শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই কোনো জমা তা'খীর করার ক্ষেত্রেও এমনটি হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য মতে সময় চলে যাওয়ার পর পরবর্তী নামাযের সাথে জমা করে আদায়কৃত পূর্ববর্তী নামায কবুল হবে না।

অতএব মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট বিষয়টিতে কোনো ধরণের শৈথিল্য প্রদর্শন না করা। কিন্তু সহীহ মুসলিমে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণ ছাড়াই যোহর ও 'আসর একত্রে এবং মাগরিব ও 'ইশা নামাযকে একত্রে আদায় করেছেন।"

এ হাদীসে দু'নামাযকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে ঢিলামির কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইবনু 'আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলো, কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে কষ্টে ফেলতে চাননি। অর্থাৎ- প্রত্যেক নামাযকে স্বীয় সময়ে আদায় করলে যে কষ্ট হয়, তাই দু'নামায একত্রে আদায় করা বৈধ হওয়ার কারণ। সুতরাং যখন প্রত্যেক নামাযকে একত্র করে আদায় করায় মুসলিমদের কষ্ট হবে তখন দু'নামাযকে একত্রে আদায় করা বৈধ বা সুন্নাত। আর কোনো অসুবিধা না থাকলে প্রত্যেক নামাযকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ওয়াজিব।

এর ভিত্তিতে বলা যায়, শুধু ঠাণ্ডার কারণে দু'নামাযকে একত্র করা বৈধ নয়। ঠাণ্ডার সাথে যদি এমন বাতাস প্রবাহিত হয় বা বরফ পড়ে, যে কারণে মসজিদে গমণ করা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে দু'নামাযকে একত্র করতে কোনো বাধা নেই। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

মসজিদে গামামাহ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

আল মাদিনা আল মুনাওয়ারায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা মাসজিদ আল-গামামাহ। এই মসজিদকে মুসাল্লাও বলা হয়। আল মাদিনা আল মুনাওয়ারার এই মসজিদের স্থানেই দ্বিতীয় হিজরি সনে মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বপ্রথম ঈদের নামায পড়েন এবং তিনি তার শেষ জীবনের ঈদের নামাযগুলোও মসজিদে গামামাহর স্থানে আদায় করেছেন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ (ﷺ) এই স্থানকে দুই ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ইতিহাস : মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সময়ে মসজিদে গামামার স্থানে কোনো মসজিদ ছিল না, তখন এটিকে ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পরে ৯১ হিজরি সনের দিকে খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আব্দুল মালেক এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। ৭৪৮ হিজরি সন থেকে ৭৫২ হিজরি সন পর্যন্ত প্রায় চার বছর দ্বিতীয়বারের মতো মসজিদে গামামার সংস্কার কাজ করেন হুসাইন বিন কালাউন। অতঃপর ৮৬১ হিজরিতে আল আশরাফির যুগে পুনরায় এই মসজিদের মেরামতের কাজ করা হয়। শেষের দিকে ওসমানি খিলাফত কালে সুলতান আব্দুল হামিদ খান এই মসজিদ সংস্কার করেন। এরপর ১৮৬১ সালে সুলতান আব্দুল মাজিদ খান ওসমানি এই মসজিদ সংস্কার করেন। বর্তমানে যে দালান আমরা দেখতে পাই, তা সুলতান আব্দুল মাজিদ খানের যুগের। সর্বশেষ ২ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল ব্যয় করে বর্তমান সৌদি সরকার ওসমানি ইমারত বহাল রেখে মসজিদের সংস্কার করেন। বর্তমানে মসজিদটি আল মাদিনা আল মুনাওয়ারায় আওকাফ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই মাসজিদটি আরও একটি ঐতিহাসিক স্মৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুহাম্মদ (ﷺ) এই মসজিদ প্রাঙ্গণেই বাদশাহ নাজ্জাশির জানাযা নামায পড়েন। বাদশাহ নাজ্জাশি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছ থেকে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম ছেড়ে পবিত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মসজিদে গামামাহর পরিবেশ অনেকটাই কোলাহলমুক্ত। এছাড়াও মসজিদে গামামাহ'র খুব কাছে মাত্র ৪০ গজের মধ্যে আরও তিনটি ছোটো ছোটো মসজিদ আছে। সেগুলো হলো মসজিদে আবূ বক্‌র, মসজিদে 'উমার ও মসজিদে 'আলী (رضي الله عنهم)।

নামকরণ : গামামাহ শব্দের অর্থ মেঘমালা। একবার অনাবৃষ্টির সময় মুহাম্মদ (ﷺ) সাহাবিদের নিয়ে এই মসজিদের স্থানে খোলা ময়দানে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামায পড়েছিলেন। নামাযের পর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পরে এই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাই এই মসজিদের নামকরণ করা হয় 'মসজিদে গামামাহ'।

অবস্থান : এই মসজিদটি আল মাদিনা আল মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্তমানে মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণের কারনে এটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। মসজিদে নববীর ৬ নম্বর গেইট দিয়ে বের হলেই সামনে পড়ে গামামা মসজিদ।

মসজিদে গামামাহর বর্তমান অবকাঠামো : আল মাদিনা আল মানোওয়ারার ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এক গম্বুজ ছাদবিশিষ্ট স্থাপনা মসজিদে গামামাহ এবং পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বা। তবে মসজিদের ছাদের উত্তর দিকে ছোটো ছোটো ৫টি গম্বুজ ও দু'টি লোহার গম্বুজের প্রবেশ দরজা রয়েছে। ৭৬৩.৭ বর্গমিটার আয়তনের মসজিদটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৩২ মিটার আর প্রস্থে সাড়ে ২৩ মিটার। মসজিদের উচ্চতা ১২ মিটার। মসজিদের প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫ (দেড়) মিটার। মসজিদটির ভিতরের পূর্ব-দিকে পাথর দিয়ে সাজানো ছোট্ট মিনারটি এটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

হাদীসে উল্লেখ : 'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদগাহে (বর্তমান মসজিদে গামামার স্থানে) গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাঁদরখানি উল্টিয়ে দিলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।[১০২] ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

[১০২] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, অধ্যায় : ১৫/বৃষ্টির জন্য দু'আ, হা. ৯৫৭, আন্তর্জাতিক হা. নং- ১০১২।*